সংগঠন তহবিল সংগ্রহ অভিযানে সমস্ত কর্মচারী সামিল হোন

সংগ্রামী হাতিয়ার

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির মুখপত্র

সংগ্রামী হাতিয়ার পড়ুন ও পড়ান

তৃতীয় ও চতুর্থ সংস্করণ, জুলাই-আগস্ট, ২০২৪ ■ ৫২তম বর্ষ ■ মূল্য ৪ টাকা

তিলোত্তমার ন্যায় বিচারের দাবিতে জনচেতনা মঞ্চের আহ্বানে প্রতিবাদ কর্মসূচী

তিলোত্তমার ন্যায় বিচারের দাবিতে জনচেতনা মঞ্চের পক্ষ থেকে ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ ধর্মতলার ডোরিনা ক্রসিং-এ দুপুর ১টা থেকে সন্ধে ৭টা পর্যন্ত এক প্রতিবাদ কর্মসূচীর আহ্বান জানানো হয়। কথা, গান, কবিতা, নাটক, নৃত্য ও অঙ্কনের মাধ্যমে রাজপথেই এই প্রতিবাদ কর্মসূচীর আয়োজন করা হয়। বহু বিশিষ্ট শিল্পী, সাহিত্যিক, অভিনেতা, নাট্যব্যক্তিত্ব, আইনজীবী, ইতিহাসবিদ, অধ্যাপক ও চিকিৎসক সহ শ্রমিক-কর্মচারী, শিক্ষকরা এই কর্মসূচীতে সামিল হন।

বিশিষ্ট সাহিত্যিক অনিতা অগ্নিহোত্রীর বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। জনচেতনা

মঞ্চের অন্যতম নেতৃত্ব বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী তাঁর বক্তব্য বলেন, আর জি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ আজ একত্রিত হয়েছেন। তাঁরা নিরাপত্তার অভাবে ভুগছেন। সরকারের দায়িত্ব একটা ভয়মুক্ত পরিবেশ তৈরি করার। কিন্তু সরকারের সেদিকে কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। উল্টে তারা অপরাধীদের আড়াল করতেই ব্যস্ত। তাই মানুষকে রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ করতে হচ্ছে।

প্রারম্ভিক বক্তব্যের পর উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন

● ষষ্ঠ পৃষ্ঠার প্রথম কলমে

কমরেড অভিজিৎ দাসের আকস্মিক জীবনাবসান

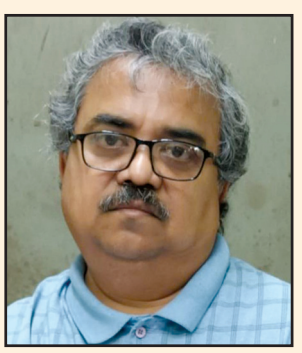

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি, লবণহ্রদ অঞ্চলের সম্পাদক, লবনহ্রদ অঞ্চল ১২ ই জুলাই কমিটির অন্যতম যুগ্ম-আহ্বায়ক এবং পশ্চিমবঙ্গ সাব-অর্ডিনেট ইঞ্জিনীয়ারিং সার্ভিস এ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি কমরেড অভিজিৎ কুমার দাস গত ২০ সেপ্টেম্বর প্রয়াত হয়েছেন। প্রয়ানকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৮ বছর। ১৯৬৬ সালে ১২ জানুয়ারি এক মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন কমরেড দাস। বাবা ছিলেন আসানসোলের একটি রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার কর্মচারী। দুই ভাই ও দুই বোনকে নিয়ে পরিবারের বামপন্থী আন্দোলনের পরিবেশে বড় হওয়া, এরই মাঝে বিদ্যালয় শিক্ষার পরে বিষ্ণুপুরের কে জি ইঞ্জিনীয়ারিং ইনস্টিটিউট থেকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এর উপর ডিপ্লোমা পাস করেন। কলেজ থেকে বেড়িয়ে প্রথমে একটি বেসরকারি সংস্থা ও পরবর্তীকালে ১৯৯৬ সালে জনস্বাস্থ্য কারিগরী দপ্তরের সাব-এ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনীয়ার হিসাবে চাকরিতে যোগদান করেন মুর্শিদাবাদ জেলায়, একই সাথে যুক্ত হন নিজের সমিতিসহ কর্মচারী আন্দোলনে। চাকরি জীবনে মুর্শিদাবাদ, আসানসোল হয়ে কলকাতা, এই নাতিদীর্ঘ সময়কালে তিনি সংগঠনের বিভিন্ন স্তরে কাজের মধ্য দিয়েই নিজের জীবন চর্চায় শ্রমিক শ্রেণীর আদর্শকে গ্রহণ করেন ও আমৃত্যু সেই মতাদর্শের প্রতি অবিচল থেকে কর্মচারী আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। সমিতির বিভিন্ন পদে দায়িত্ব পালনের পরে ২০২৪ সালে তিনি সমিতির সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হন। এছাড়াও ২০০৪ সালে কলকাতায় আসার পরে ২০১৭ থেকে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির লবণ হ্রদ অঞ্চলের সম্পাদক ও পরবর্তীকালে ২০২২ সাল থেকে কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। দীর্ঘ সময় ধরে কর্মচারী আন্দোলনে যুক্ত থাকাকালীন কর্মচারীদের কাছের মানুষ হিসাবে গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠেন তিনি। প্রশাসনিক কাজে দক্ষতা ও কর্মচারীদের সমস্যা নিয়ে তাঁর সদাহাস্যময় উপস্থিতি তাঁকে খুব দ্রুতই গ্রহণযোগ্য করে তোলে। তাঁর এই মৃত্যুতে সংগঠন হারালো একজন দক্ষ সংগঠককে। মৃত্যুকালে তিনি রেখে গেলেন একমাত্র কণ্যা সন্তান, স্ত্রী ও বৃদ্ধ বাবাকে। কমরেড অভিজিৎ দাসের মরদেহে পুষ্প স্তবক দিয়ে শেষ শ্রদ্ধা জানান মণিশঙ্কর মণ্ডল, সুমন কান্তি নাগ, মানস দাস, স্বপন রায়, আশীষ ভট্টাচার্য্য, চুনীলাল মুখার্জী, ভাস্কর ভট্টাচার্য সহ সমিতি ও রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির নেতৃবৃন্দ।

৪ ঠা অক্টোবর ২০২৪ রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি, পশ্চিমবঙ্গ সাব-অর্ডিনেট ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিস এ্যাসোসিয়েশন ও ১২ জুলাই কমিটির লবণ হ্রদ অঞ্চল শাখার উদ্যোগে একটি স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। সমিতি, কো-অর্ডিনেশন কমিটির লবণহ্রদ অঞ্চলের যথাক্রমে সম্পাদক, যুগ্ম সম্পাদক, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী, ১২ জুলাই কমিটির অন্যতম যুগ্ম আহ্বায়ক সুমিত ভট্টাচার্য সহ কর্মচারী আন্দোলনের নেতৃত্ব এবং পরিবারের পক্ষ থেকে কমরেড দাসের স্মরণে বক্তব্য রাখেন।

২৯ শে অক্টোবর ২০২৪, কলকাতার কর্মচারী ভবনে সমিতির উদ্যোগে কেন্দ্রীয় স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত সভায় সমিতির সাধারণ সম্পাদক মণিশংকর মণ্ডল, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী, কর্মচারী আন্দোলনের প্রবীণ নেতৃত্ব কমরেড প্রবীর মুখার্জী সহ পরিবারের পক্ষ থেকে কমরেড দাসের একমাত্র কণ্যা অনুষ্মিতা দাস বক্তব্য রাখেন। □

রাজ্য কাউন্সিল সভার আহ্বান

২৬ নভেম্বর '২৪ প্রতিটি জেলাতে অবস্থান-বিক্ষোভ কর্মসূচী

গত ২৮ অক্টোবর ২০২৪ কেন্দ্রীয় কমিটির সভার অনুমোদনক্রমে গত ২৯ অক্টোবর ২০২৪ জরুরি ভিত্তিতে সামাজিক মাধ্যমে অনুষ্ঠিত রাজ্য কাউন্সিল সভা থেকে বিগত কর্মসূচীর পর্যালোচনা সহ আগামী কর্মসূচী বিষয়ে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। সভার প্রারম্ভে সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী প্রস্তাবনার উপর জেলাগুলির পক্ষ থেকে আলোচনার পর জবাবী বক্তব্য পেশ করেন যুগ্ম সম্পাদক দেবব্রত রায়।

সিদ্ধান্তসমূহ ঃ

১। ১১-২২ নভেম্বর, ২০২৪, রাজ্যের সর্বত্র টিফিনের বিরতিতে সরকারী কর্মচারীদের অধিকারের উপর নামিয়ে আনা স্বৈরতান্ত্রিক আক্রমণের বিরুদ্ধে মহামান্য সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের নির্দেশক্রমে এবং পরবর্তীতে PoSH Act. 2013 (Prevension, Prohibition and Redressal Act) অনুসারে 'বিশাখা নির্দেশিকা' কার্যকরী করার দাবিতে স্মারকলিপি পাঠ ও স্থানীয় আধিকারিকের কাছে ডেপুটেশন দিতে হবে।

২। আগামী ২৬ নভেম্বর ২০২৪ ১৩ দফা দাবিতে বেলা ১২টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত জেলার জনবহুল জায়গায় কর্মচারী জমায়েত ও অবস্থান বিক্ষোভ সভা সংগঠিত করতে হবে।

৩। ২৬ নভেম্বর ২০২৪ অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচী সফল করার লক্ষ্যে কর্মসূচীর আগের দিন অর্থাৎ ২৫ নভেম্বর ২০২৪ সারাদিন ব্যাপী ব্যাজ পরিধান ও জেলা শাসকের (দার্জিলিং জেলার ক্ষেত্রে মহকুমা শাসক) কাছে বিশাখা নির্দেশিকা কার্যকরী করা সংক্রান্ত স্মারকলিপি নিয়ে স্থানীয় কর্মচারী জমায়েত করে ডেপুটেশন কর্মসূচীর সফল রূপায়ন করতে হবে। পাশাপাশি, গত ২৬ সেপ্টেম্বর, ২৪ সাত দফা দাবিতে অনুষ্ঠিত জেলা জমায়েত ও জেলা শাসকের কাছে ডেপুটেশন কর্মসূচীর সর্বশেষ অগ্রগতির বিষয়টি আলোচনায় আনতে হবে।

সামগ্রিক এই কর্মসূচীর বার্তা সর্বত্র পৌঁছে দিতে সামাজিক মাধ্যমকে ব্যবহার করে ব্যাপক প্রচার সংগঠিত করতে হবে।

৪। বিগত রাজ্য কাউন্সিলের

● ষষ্ঠ পৃষ্ঠার প্রথম কলমে

বকেয়া মহার্ঘভাতার দাবিতে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি

অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের জন্য আরও ৩ শতাংশ মহার্ঘভাতা ঘোষিত হয়েছে, যা ১ জুলাই '২৪ থেকে কার্যকর হবে। এর ফলে কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের তুলনায় এ রাজ্যের সরকারী কর্মচারীদের মহার্ঘভাতার ফারাক দাড়িয়েছে ৩৯ শতাংশ। স্বাভাবিকভাবেই রাজ্যের সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ সৃষ্টি হয়েছে। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির আহ্বানে বকেয়া মহার্ঘভাতা অবিলম্বে প্রদানের দাবিতে ২২, ২৩ অক্টোবর রাজ্যের সবক'টি দপ্তরে টিফিন বিরতিতে বিক্ষোভ কর্মসূচী প্রতিপালিত হয়। একই সাথে সংগঠনের পক্ষ থেকে এই বিষয়ে সুরাহা চেয়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দেওয়া হয়।

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী
পশ্চিমবঙ্গ সরকার,
নবান্ন, হাওড়া

বিষয় ঃ কেন্দ্রীয় হারে বকেয়া মহার্ঘভাতা প্রদান

মাননীয়া,

আমরা সকলেই জানি মহার্ঘভাতা প্রদানের বিষয়টির সাথে মূল্যবৃদ্ধির প্রত্যক্ষ সম্পর্ক রয়েছে। মহার্ঘভাতা মানে বেতন বৃদ্ধি নয়, মূল্যবৃদ্ধিজনিত বেতনের ক্ষয়রোধের একটি কল্যাণমূলক ব্যবস্থা। স্বভাবতই যে সময়ে খাদ্যশস্য সহ নিত্যপ্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্যের ধারাবাহিক মূল্যবৃদ্ধি একটি গুরুতর সমস্যা হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে, এমনকি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পক্ষ থেকেও উদ্বেগ প্রকাশ করা হচ্ছে, তখন মহার্ঘভাতা প্রদান সম্পর্কে সরকার ইতিবাচক অবস্থান গ্রহণ করবে এটাই প্রত্যাশিত। কেন্দ্র ও প্রায় সবক'টি রাজ্যের সরকার সময়ান্তরে এই স্বাভাবিক ও প্রত্যাশিত সিদ্ধান্তই গ্রহণ করছে। কোনো বিশেষ মহানুভবতার কাজ করছে না। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন, মূল্যবৃদ্ধির সমস্যাটি যেহেতু একটি জাতীয় সমস্যা, তাই সর্বভারতীয় ভোগ্যপণ্যের মূল্য সূচকের (এ আই সি পি আই) ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলি মহার্ঘভাতা প্রদান করে। এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার যে হারে মহার্ঘভাতা ঘোষণা করে, রাজ্য সরকারগুলিও তাকে অনুসরণ করে।

অথচ আমাদের রাজ্যে আপনার নেতৃত্বাধীন সরকার এই স্বাভাবিক ও প্রত্যাশিত কাজটিকেও দীর্ঘদিন ধরেই চরম অবহেলা করছে। যার পরিণতি হল বিপুল পরিমাণ (৩৯ শতাংশ) বকেয়া মহার্ঘভাতা। ষষ্ঠ বেতন কমিশন কার্যকরী হওয়ার পরে, এখন পর্যন্ত মাত্র ১৪ শতাংশ মহার্ঘভাতা প্রদান করা হলেও, তা করা হয়েছে কেন্দ্রীয় হার অনুসরণ না করেই। দেশব্যাপী স্বীকৃত পদ্ধতি থেকে এটি গুরুতর বিচ্যুতি।

দেশব্যাপী স্বীকৃত এই স্বাভাবিক প্রাপ্তি থেকে রাজ্যের শ্রমিক, কর্মচারী ও শিক্ষকদের কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়াই বঞ্চিত করে রাখার যে পথ সরকার গ্রহণ করেছে, তাতে সংশ্লিষ্ট অংশ ব্যথিত এবং ক্ষুব্ধও। গণতান্ত্রিক পরিসরেই এই ক্ষোভের বহুবিধ বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। এমনকি উচ্চ আদালতও রাজ্যসরকারের ভিত্তিহীন নেতিবাচক ভূমিকাকে মান্যতা দেয়নি। এতদ্‌সত্ত্বেও রাজ্য সরকারের ভূমিকার কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। এমনকি মূল্যবৃদ্ধির আবহে নিয়মিত মহার্ঘভাতা প্রদান যে আবশ্যিক, তাকে অস্বীকার করে, একে নির্দিষ্ট অংশের 'বিলাসিতা' বলে চিহ্নিত করে, পরিকল্পিতভাবে জনসমাজের অপরাপর অংশের সাথে বিভাজন তৈরি করার চেষ্টা করা হচ্ছে। ভ্রান্ত এই অপচেষ্টায় নিশ্চিতভাবেই নিন্দনীয় ও কঠোর সমালোচনার যোগ্য।

৩৯ শতাংশ মহার্ঘভাতা বকেয়া থাকার ফলে প্রতি মাসে একজন বেতনভুক কর্মচারী বা শিক্ষকের কত টাকার বঞ্চনা হচ্ছে, তা আপনি নিশ্চয়ই অনুধাবন করছেন। টাকার অঙ্কে এই বিপুল ক্ষতি একজন কর্মচারী বা শিক্ষকের আর্থ-সামাজিক সুস্থিতিকেও দুর্বল করছে। অথচ আর্থিক বঞ্চনার সাথে পাল্লা দিয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে কাজের বোঝা। একজন কর্মচারী বা শিক্ষককে তাঁর নির্দিষ্ট দায়িত্বের বাইরেও বিভিন্ন ধরনের অতিরিক্ত দায়িত্বও পালন করতে হচ্ছে। ক্রমাগত বেতন ক্ষয়ের শিকার একজন কর্মচারী বা শিক্ষকের পক্ষে অতিরিক্ত কাজের বোঝা বইবার মতো মানসিক প্রণোদনা মজুত রাখা সম্ভব বলে মনে হয় কি আপনার? কখনোই নয়। এমতাবস্থায়, এযাবৎকাল মহার্ঘভাতা সম্পর্কে রাজ্য সরকার যে নেতিবাচক অবস্থান গ্রহণ করে চলেছে, তা থেকে সরে এসে, কেন্দ্রীয় হারেই বকেয়া প্রদানে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়া প্রয়োজন। এটি সংশ্লিষ্ট অংশের ন্যায়সঙ্গত চাহিদা। যাকে মান্যতা দেওয়ার পথ সরকার গ্রহণ করুক এটাই আমাদের দাবি।

অতীতে বিভিন্ন ভাবে একই দাবি পেশ করে বিফল হলেও, পুনরায় রাজ্য সরকারের সুবিবেচনার প্রত্যাশা নিয়েই এই দাবি পেশ করা হচ্ছে।

ধন্যবাদ সহ—

তাং-২৯/১০/২৪

ভবদীয়
বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী
(বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী)
সাধারণ সম্পাদক

সম্পাদকীয়

দেশের আবহমান শ্রমিক আন্দোলনে আরেকটি মাইল স্টোন

এই কথা ঐতিহাসিকভাবে সত্য যে শ্রমিক সংগঠন বা ট্রেড ইউনিয়নগুলি পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় শ্রমেয় যে পণ্যীকরণ ঘটে তার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয় এবং এই ব্যবস্থায় শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে যে সহজাত অসম সম্পর্ক থাকে তাকেও চ্যালেঞ্জ জানায়। শ্রমিক শব্দটি শ্রম আইন অথবা রাজনীতির ভাষায় একটি সমষ্টিগত বিষয় হলেও, সেটা মূর্ত হয়ে ওঠে ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনের মাধ্যমে, শ্রমিকদের সমষ্টিগত চরিত্র বাস্তবে প্রতিফলিত হল তামিলনাড়ুর শ্রীপেরামবুদুরে স্যামসাঙ কারখানাতে শ্রমিকদের সাম্প্রতিক ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। একটি বৃহৎ বহুজাতিক সংস্থার কারখানায় তাদের নিজস্ব কিছু দাবিতে লাগাতার ৩৭ দিনের ধর্মঘট শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে স্থান করে নেবে।

তামিলনাড়ুর কাঞ্চিপুরম জেলার শ্রীপেরামবুদুরে অবস্থিত স্যামসাঙ-এর ইলেকট্রনিক সামগ্রী নির্মাণের একটি কারখানায় শ্রমিকেরা মজুরি বৃদ্ধি, কাজের সময় কমানো, আরও উন্নত কাজের পরিবেশ সৃষ্টির দাবি সহ আরও কিছু দাবিতে ধর্মঘটে যায়। বিগত এক দশকে ঐ কারখানার শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি কার্যত ঘটেই নি। শ্রমিকদের উপর নির্মম শোষণ চলে সেখানে। চার-পাঁচ ঘণ্টা টানা কাজ করার পর শ্রমিকরা ১০-১৫ সেকেন্ডের একটু দম ফেলার ফুরসত পান। শ্রমিকদের মজুরী বৃদ্ধির কোনো তোয়াক্কা করে না ম্যানেজমেন্ট। এই সংস্থার অনেক প্ল্যান্ট আছে ভারতের বিভিন্ন জায়গায়। তথ্য বলছে ২০২২-২৩ আর্থিক বছরে আমাদের দেশে স্যামসাঙ-এর মোট মুনাফার পরিমাণ ৯৮,৯২৪ কোটি টাকা। ভারতে সব মিলিয়ে বার্ষিক মোট আয়ের তিনভাগের এক ভাগ আসে তামিলনাড়ুর এই প্ল্যান্ট থেকে। অথচ শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধির বিষয় কোনো বিবেচনায় আসে না কারখানা কর্তৃপক্ষের। দীর্ঘদিনের এই অমানবিক শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য সি আই টি ইউ-র উদ্যোগে সেখানকার শ্রমিকরা স্যামসাঙ ইন্ডিয়া ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন বা SIWU গঠন করে। মালিকপক্ষ স্বাভাবিক কারণেই এই ইউনিয়ন মানতে চায়নি। রাজ্যের শ্রমদপ্তর এই সংগঠনের রেজিস্ট্রেশন করতে গরিমসি করতে থাকে। ইউনিয়নের স্বীকৃতির দাবিও ছিল ধর্মঘটের অন্যতম দাবি।

নয়া উদার অর্থনীতির যুগে একটি বহুজাতিক সংস্থায় লাগাতার ৩৭ দিনের ধর্মঘট কোনো মামুলি বিষয় নয়। এই আন্দোলন ভাঙতে কর্তৃপক্ষ চেষ্টার কোনো কসুর করেনি। ইউনিয়নের ৮ জন নেতৃত্বকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। ধর্মঘট ভাঙার জন্য নানা ধরনের দমন-নীপিড়ন চলে। ধর্মঘটকারীদের বেতন বন্ধ করে দেওয়া হয়। ম্যানেজমেন্ট তাদের তাবেদার কিছু শ্রমিক, যারা ধর্মঘট আন্দোলনকে ভাঙার চেষ্টা করেছে, তাদের নিয়ে একটি শ্রমিক কমিটি গঠন করে। SIWU-কে স্বীকৃতি না দিয়ে, তাদের সাথে আলোচনা না করে এই তথাকথিত শ্রমিক কমিটির সাথে আলোচনায় বসে। সেই আলোচনায় রাজ্যের শিল্পমন্ত্রীর উপস্থিতিও তাৎপর্যপূর্ণ। আলোচনার পর ম্যানেজমেন্ট লোক দেখানো কিছু ইনসেনটিভ ঘোষণা করে বলে আলোচনায় সব দাবি মেনে নেওয়া হয়েছে। অতএব শ্রমিকরা এবার কাজে যোগ দিক। SIWU-র নেতৃত্ব দেড় হাজারের বেশি শ্রমিক কর্তৃপক্ষের এই চাতুরিকে কোনো পাত্তা না দিয়ে ধর্মঘট চালিয়ে যেতে থাকে।

লাগাতার ধর্মঘটে অবিচল থাকা নাছোড় শ্রমিকদের কাছে অবশেষে মাথা নোয়াতে বাধ্য হয় কারখানা কর্তৃপক্ষ। তারা SIWU-র প্রতিনিধিদের আলোচনার জন্য আহ্বান জানায়। এই আহ্বান জানানোর মধ্য দিয়ে SIWU-কে কার্যত স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয় কারখানা কর্তৃপক্ষ। ১৪, ১৫ অক্টোবর দুইদিন ধরে ত্রিপাক্ষিক বৈঠক হয় চেন্নাই-এর সচিবালয়ের অফিসে। রাজ্য সরকারের চারজন মন্ত্রী এই বৈঠকে সরকারের প্রতিনিধিত্ব করে। বৈঠকে শ্রমিকদের দাবিগুলি মান্যতা পায়। SIWU-র দাবি অনুযায়ী কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করে যে ধর্মঘটীদের বিরুদ্ধে কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না। ১৬ অক্টোবর SIWU তাদের জেনারেল বডি সভা করে ধর্মঘট প্রত্যাহারের কথা ঘোষণা করে। ১৭ অক্টোবর থেকে ঐ কারখানায় শ্রমিকরা কাজে যোগ দেয়। তবে তাদের লড়াই জারি রাখার ঘোষণা করে।

নয়া উদারনীতির অভিঘাতে 'সংগঠিত শ্রমিক' কথাটি ক্রমে অবলুপ্তির পথে। শ্রম আইন পরিবর্তিত করে সেই আইনকে আরও বেশি শ্রমজীবীদের প্রতিকূল এবং শ্রমিক আন্দোলন দমনের হাতিয়ার হিসাবে পরিণত করা হচ্ছে। হায়ার অ্যান্ড ফায়ারের খাড়া সবসময় ঝুলছে শ্রমিকদের মাথার উপর। গোটা বিশ্বজুড়ে এই ধরনের পরিস্থিতি যখন বিরাজমান সেইরকম পরিস্থিতিতে ভারতে একটি বহুজাতিক সংস্থার কারখানায় এক-দু'দিন নয়, টানা ৩৭ দিন ধর্মঘট করা শ্রমিকেরা দেশের সব অংশের শ্রমিক কর্মচারী তথা খেটে খাওয়া মানুষকে শিক্ষা দিয়েছে। এই আন্দোলনে সি আই টি ইউ নেতৃত্বের ভূমিকা অস্বীকার করা যাবে না। তাদের নেতৃত্বেই স্যামসাঙ কারখানার শ্রমিকদের এই আন্দোলন কার্যত শ্রেণী আন্দোলনের রূপ নিয়েছে।

এই আন্দোলনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল, এর বার্তা একটি রাজ্যের সীমানা অতিক্রম করে, দেশের বাইরেও পৌঁছে গেছে। সারা বিশ্বের যেখানে যেখানে স্যামসাঙ-এর প্ল্যান্ট আছে প্রায় সব জায়গায় সেখানকার শ্রমিক কর্মচারীরা এই আন্দোলনে সংহতি জানিয়েছে। তামিলনাড়ুতে জে কে টায়ায়, অ্যাপোলো টায়ার, হুণ্ডাই, ইয়ামাহা, বি এম ডব্লু প্রভৃতি সংস্থার কারখানার শ্রমিকরা সংহতি জানিয়েছে। শুধু শ্রমিকরা নয়, ব্যাঙ্ক, বীমার কর্মচারী, সরকারী কর্মচারী, রাষ্ট্রায়ত্ব ক্ষেত্রের কর্মচারীরাও পাশে দাঁড়িয়েছে এই আন্দোলনের। পাশে দাঁড়িয়েছে সেই রাজ্যের বামপন্থী ছাত্র-যুব-মহিলাদের সংগঠনগুলি। সি আই টি ইউ-র নেতৃত্বে রাজ্যজুড়ে পিকেটিং, রাস্তা অবরোধ হয়েছে এই আন্দোলনের সমর্থনে। এই সংগ্রামের পক্ষে সোচ্চার ছিল রাজ্যের বাম দলগুলি। ৩৭ দিন টানা ধর্মঘটে গুরুত্বপূর্ণ রসদ হিসাবে কাজ করেছে বাইরের এই বিপুল অংশের সমর্থন।

স্যামসাঙ কারখানার শ্রমিকদের সংগঠিত হবার অথবা ইউনিয়ন গঠন করার অধিকার তো সংবিধানে স্বীকৃত। সংবিধানের ১৯(১)গ ধারায় এই অধিকার স্বীকৃত। কেন তামিলনাড়ু সরকার SIWU-কে নিবন্ধীকরণ করছে না? ট্রেড ইউনিয়ন আইন (১৯২৬)-এ বলা আছে আবেদনের ৪৫ দিনের মধ্যে ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। SIWU আবেদন করেছিল ২৭ জুন '২৪, অর্থাৎ ধর্মঘটে যাবার প্রায় ৯০ দিন আগে। এতদিনেও সরকার এই কাজ করতে পারল না কেন? নাকি তামিলনাড়ু সরকারও নয়া উদারনীতির হাওয়ায় ভেসে কর্পোরেট বান্ধব হিসেবে নিজেকে জাহির করতে চাইছে। এই প্রশ্ন যেমন তুলে দিয়েছে এই আন্দোলন, একই সাথে প্রশ্নের উত্তরটাও সপাটে দিয়েছে কর্পোরেট মালিক ও তার সাগরেদদের।

সংগঠন করার অধিকার সংবিধান স্বীকৃত মৌলিক অধিকার। এই আধিকার আদায়ের লড়াইয়ে আত্মসমর্পণের কোনো জায়গা নেই স্যামসাঙ কারখানার শ্রমিকরা সেটা আবার প্রমাণ করল। ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার, যৌথ দরকষাকষির অধিকারের স্বীকৃতি তীব্র লড়াই করে আদায় করে তবে কাজে ফিরেছে তারা। ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস বৈচিত্র্যময়। ঔপনিবেশিক শাসনকালে শ্রমিক শোষণ এবং শোষণমূলক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে শ্রমিক আন্দোলন ঔপনিবেশিকতা বিরোধী আন্দোলনে সম্পৃক্ত হয়েছে। স্যামসাং কারখানার শ্রমিকদের এই আন্দোলন গোটা দেশের শ্রমিক-কর্মচারীদের নয়া উদার অর্থনীতির বিরোধী মূল স্রোতের আন্দোলনকে নতুন গতি দিক, এটাই কাম্য। □

৩০ নভেম্বর, ২০২৪

শোক সংবাদ

কমরেড সীতারাম ইয়েচুরি

গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা রক্ষার সংগ্রামের অক্লান্ত সৈনিক, প্রাক্তন সাংসদ এবং সিপিআই(এম)-এর সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরি গত ১২ সেপ্টেম্বর '২৪ নয়া দিল্লির এইমস্ হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭২ বছর। তিনি হাসপাতালে ফুসফুসে গুরুতর সংক্রমণ নিয়ে ভর্তি ছিলেন। তাঁর স্ত্রী, এক পুত্র ও এক কন্যা বর্তমান। ইয়েচুরি ছিলেন ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলন তথা বামপন্থী আন্দোলনের একজন অবিসংবাদী নেতা এবং সুপরিচিত মার্কসবাদী তাত্ত্বিক। তিনি ২০১৫ সালে সিপিআই(এম)-এর সাধারণ সম্পাদক হন। আমৃত্যু তিনি ঐ পদে ছিলেন।

ছাত্রাবস্থায় তিনি ছিলেন একজন অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র। যিনি ইকনমিক্স-এ স্নাতক ও স্নাতকোত্তর উভয় ক্ষেত্রে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন। ১৯৭৪-এ দিল্লির জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠরত অবস্থায় বামপন্থী আন্দোলনে যুক্ত হন এবং এস এফ আই-এর নেতা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হন। পরবর্তীকালে তিন দফায় এস এফ আই-এর সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৭৫ সালে সিপিআই(এম)-এর সদস্যপদ লাভ করেন। জরুরি অবস্থার সময় কারাবরণ করেন। ১৯৮৫ সালে সিপিআই(এম) পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য, ১৯৯২ সালে পলিটব্যুরোর সদস্য হন। ২০১৫ সালে পার্টির ২১তম কংগ্রেসে তিনি সাধারণ সম্পাদক হিসাবে নির্বাচিত হন।

বিগত শতাব্দীর নব্বই দশকের শুরুতে যখন সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপে সমাজতন্ত্রের বিপর্যয় ঘটে তখন তিনি গোটা দেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনের তাত্ত্বিক ভিত্তিকে দৃঢ় ও মজবুত রাখার কঠিন লড়াইয়ে একজন অগ্রণী সৈনিক হিসাবে তাঁর ভূমিকা পালন করেছিলেন। ১৯৯২-এর ৬ ডিসেম্বর সংঘ পরিবারের প্ররোচনায় ঐতিহাসিক বাবরি মসজিদ ধ্বংসের পরবর্তীকালে সাম্প্রদায়িক শক্তির উত্থান এবং দেশের শাসন ক্ষমতায় আসীন হওয়ার বিপদ সম্বন্ধে মানুষকে সচেতন করার ক্ষেত্রে এবং বাম-গণতান্ত্রিক-ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক দলগুলিকে এই বিপদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ করার সংগ্রামে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।

২০১৪ সালে কেন্দ্রে বিজেপি এককভাবে ক্ষমতায় আসার পর দেশের ধর্মনিরপেক্ষতা, সংবিধান রক্ষার লড়াইয়ে তিনি ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করে গেছেন। অষ্টাদশ লোকসভা নির্বাচনের পূর্বে সমস্ত ধর্মনিরপেক্ষ বিরোধী দলগুলিকে নিয়ে একটি বৃহত্তর ঐক্য গড়ে তোলার জন্য সীতারাম ইয়েচুরি লড়াই করেছেন। পরবর্তীকালে যা 'ইন্ডিয়া' মঞ্চ হিসাবে স্বীকৃতি পায়। ধৈর্যশীল মনন থাকায় রাজনৈতিক জগতে তাঁর প্রচুর বন্ধু ছিল। ইয়েচুরি ২০০৫-২০১৭ দুটি পর্বে এই রাজ্য থেকে রাজ্যসভার সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। ২০১৭ সালে তিনি শ্রেষ্ঠ সাংসদের পুরস্কার পান।

সীতারাম ইয়েচুরির মৃত্যু দেশের বামপন্থী আন্দোলন তথা ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ-গণতান্ত্রিক প্রজাতান্ত্রিক ব্যবস্থার উপর যে ভয়াবহ আক্রমণ চলছে তার বিরুদ্ধে সংগ্রামে একটা বড় ক্ষতি হল এটা বলা যেতে পারে। □

কমরেড দিলীপ ব্যানার্জী

পশ্চিমবঙ্গ সাব-অর্ডিনেট ইঞ্জিনীয়ারিং সার্ভিস এ্যাসোসিয়েশনের প্রাক্তন সভাপতি, প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক ও রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কেন্দ্রীয় কমিটির প্রাক্তন সদস্য কমরেড দিলীপ ব্যানার্জী গত ১৮ নভেম্বর ২০২৪ প্রয়াত হয়েছেন। প্রয়ানকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৭ বছর।

১৯৫৭ সালে সেপ্টেম্বর মাসে এক মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন কমরেড ব্যানার্জী। কমরেড ব্যানার্জীর বাবা ছিলেন নদীয়ার ধুবুলিয়ার একটি স্কুলের শিক্ষক, চার ভাই নিয়ে এক মধ্যবিত্ত পরিবারের প্রগতিশীল পরিবেশে বড় হওয়া, এরই মাঝে গ্রামীণ বিদ্যালয় থেকে শিক্ষালাভের পরে ১৯৭৯ সালে কৃষ্ণনগরের বি পি সি ইনস্টিটিউট অব্ টেকনলজি থেকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর উপর ডিপ্লোমা পাস করেন। কলেজ থেকে বেড়িয়ে ১৯৮১ সালের মে মাসে সেচ দপ্তরের সাব-এ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনীয়ার হিসাবে বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর মহকুমায় চাকরিতে যোগদান করেন, একই সাথে যুক্ত হন নিজের সমিতিসহ কর্মচারী আন্দোলনে। চাকরি জীবনের শুরু থেকেই তিনি সংগঠনের বিভিন্ন স্তরে কাজের মধ্য দিয়েই নিজের জীবনচর্চায় শ্রমিক শ্রেণীর আদর্শকে গ্রহণ করেন ও আমৃত্যু সেই মতাদর্শের প্রতি অবিচল থেকে কর্মচারী আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। যেকোনো বিষয়ে গভীরে যাওয়ার আগ্রহ ও অনুসন্ধিৎসা, প্রশাসনিক নিয়মাবলী ও কর্মচারীদের সমস্যা নিরসনের যোগ্যতা, সৃজনশীল ও সৌন্দর্যপূর্ণ বক্তব্য, মিতভাষী, কর্মচারীদের সাথে নমনীয় ব্যবহার অথচ আদর্শের প্রতি কঠোর অবস্থান তাঁকে খুব দ্রুতই সংগঠনের নেতৃত্ব হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করে এবং ১৯৮৩ সালে তিনি সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হন। ১৯৯১ সালে কলকাতায় আসার পরে সমিতির বিভিন্ন পদে দায়িত্ব পালনের পরে ২০০৬ সাল থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত তিনি সমিতির সাধারণ সম্পাদক ও ২০১৪ সাল থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত তিনি সমিতির সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়াও ২০০৬ সাল থেকে সমিতির সাধারণ সম্পাদক হওয়ার পরবর্তীতে তিনি রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। দীর্ঘ সময় ধরে কর্মচারী আন্দোলনে যুক্ত থাকাকালীন কর্মচারীদের কাছের মানুষ হিসাবে গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠেন তিনি। ২০১১ সালে রাজ্যের পটপরিবর্তনের পরে রাজ্যে চলতে থাকা শ্বাসরোধকারী নৈরাজ্যের পরিস্থিতি ও কর্মচারীদের প্রতি তীব্র আর্থিক বঞ্চনা ও প্রত্যক্ষ নিপীড়ণের বিরুদ্ধে লাগাতার আন্দোলনে সামনে থেকে নেতৃত্ব দেওয়ার মাঝেই ২০১৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি চাকরী থেকে অবসরগ্রহণ করেন। তৎপরবর্তীতে স্নায়ুরোগে আক্রান্ত হয়ে বাড়িতে চিকিৎসাধীন ছিলেন। তাঁর এই মৃত্যুতে সংগঠন হারালো একজন দক্ষ সংগঠককে। মৃত্যুকালে তিনি রেখে গেলেন দুই কন্যা সন্তান, স্ত্রী ও এক জামাতাকে। বিগত ১৯ নভেম্বর সমিতির কেন্দ্রীয় দপ্তরে (এন আর এস হাসপাতাল) কমরেড দিলীপ ব্যানার্জীর মরদেহে পুষ্প অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানান রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির দুই সহ-সম্পাদক শাশ্বতী মজুমদার, প্রণব কর সহ মণিশঙ্কর মণ্ডল, মানস দাস, সুমন কান্তি নাগ, অনন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, শঙ্কর সেনগুপ্ত, প্রদীপ নাগ, বানী ব্যানার্জী সহ সমিতি ও কর্মচারী আন্দোলনের নেতারা। □

শ্রীলঙ্কায় প্রথমবারের জন্য বামপন্থী রাষ্ট্রপতি

জনতা বিমুক্তি পেরুমনা (জে ডি পি) দল ও বামপন্থী ও প্রগতিশীল দলগুলির জোট ন্যাশনাল পিপল্স পাওয়ার-এর নেতা অনুরা কুমারা দিশানায়েকে শ্রীলঙ্কার রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়েছেন। গত ২১ সেপ্টেম্বর '২৪-এর হওয়া নির্বাচনে তিনি ৫৭,৪০,১৭৯ ভোট (৪২.৩ শতাংশ) পেয়েছেন। তাৎপর্যপূর্ণভাবে তাঁর ভোট বৃদ্ধি ঘটেছে। বিগত ২০১৯-এর নির্বাচনে তিনি মাত্র ৪, ১৮,৫৫৩ ভোট (৩.১৬ শতাংশ) পেয়েছিলেন। প্রথমবারের জন্য শ্রীলঙ্কায় কোনো বামপন্থী নেতা রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে জয়লাভ করলেন।

দিশানায়েকের উপর জনসমর্থনের ঢেউ এবং তার জয়ের পিছনে প্রত্যক্ষ কারণ হল তার দল জে ডি পি-র ২০২২-এ ব্যাপক গণআন্দোলন যা 'আরোগালায়া' নামে খ্যাত তাতে যথাযোগ্য ভূমিকা প্রতিপালন। জনগণ ব্যাপক দুর্নীতি, জ্বালানি এবং গ্যাস সহ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের ঘাটতিতে তিতিবিরক্ত হয়ে উঠেছিল। তারা রাষ্ট্রপতি রাজাপক্ষে-র বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আন্দোলনে মুখর হয়ে ওঠে। কৃষকদের দুর্দশা, মুদ্রাস্ফীতি, বেকারী, মানুষের জীবন ধারনের মানের ব্যাপক অবনমন—এসব কিছুর বিরুদ্ধে এতদিনকার চাপা ক্ষোভ গণআন্দোলনের রূপ নেয়। যার পরিণতিতে রাজাপক্ষে পদত্যাগ করতে বাধ্য হন এবং দেশ ছেড়ে পালিয়ে যান। ক্ষমতা দুটি মূল শাসকদলের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে রনিল বিক্রমসিংঘেকে রাষ্ট্রপতি করা হয়। কিন্তু তিনিও চূড়ান্ত ব্যর্থ হন। সেই সময় অসাম্য ভয়াবহ চেহারা নেয় শ্রীলঙ্কায়। উপরের দিকের ২০ শতাংশ মানুষের দখলে চলে যায় দেশের মোট আয়ের অর্ধেক অংশ। বিক্রমসিংঘে সমস্যা সমাধানে কড়া শর্তে আই এম এফ থেকে টাকা ঋণ নেন। যার পরিণতি হয় আরও খারাপ। দিশানায়েকে এবং তার দল নির্বাচনী ইস্তেহারে জনগণের মূল সমস্যাগুলিকে সমাধানের কথা বলেছে। অর্থনীতির ক্ষেত্রে সংস্কার করে সমাজে বৈষম্য দূর করার কথা বলা হয়। ভাষাগত ও ধর্মীয়

● চতুর্থ পৃষ্ঠার প্রথম কলমে

কর্মস্থলে সম্মানজনক পরিবেশ রক্ষায় সংগ্রামই একমাত্র পথ

বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী

পশ্চিমবঙ্গের মধ্যবিত্ত কর্মচারী সমাজের চলমান আন্দোলনের ক্ষেত্রে বারে বারে যে সংগঠন কখনও এককভাবে, কখনও বৃহত্তর পরিসরে যৌথভাবে বিভিন্ন সংগঠনকে একত্রিত করে নেতৃত্বদায়ী ভূমিকা পালন করে চলেছে তার নাম রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি। একজন নবীন কর্মচারী প্রশাসনের অভ্যন্তরে কর্মচারী সত্তা নিয়ে প্রবেশের পাশাপাশি সংগঠনের কাজে যুক্ত হয়ে সাংগঠনিক সত্তার বিকাশ ঘটান, একাজের মূল কারিগর রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি ও তার অভ্যন্তরে থাকা বিভিন্ন সমিতি।

রাজ্যে পট পরিবর্তনের পরবর্তীতে প্রশাসনের শীর্ষতম স্তর থেকে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটিকে ভাঙার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। ২০১১ সাল পরবর্তীতে আমলাতন্ত্রের একাংশ ও কর্মচারীদের মধ্যে থাকা শাসকদলের তল্পিবাহক, গোষ্ঠীর যোগসাজসে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি ও তার অন্তর্ভুক্ত সমিতিগুলির কর্মী নেতৃত্বকে নীতি বহিঃর্ভূত বদলী করে সাধারণ কর্মচারীদের ভীত-সন্ত্রস্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে। শুরুর দিকে শাসকদলের তল্পিবাহক গোষ্ঠীর হুমকি ও শাসানিতে একাংশের কর্মচারী বন্ধুদের কিছুটা ভীতি কাজ করেছিল। পরিবার ছেড়ে বহু দূরে বদলী হওয়ার শঙ্কা তাঁদের মধ্যে কাজ করেছিল যা অস্বাভাবিক নয়। এই ধরনের 'হুমকি সংস্কৃতি' রাজ্যে গত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে চলছেই। আমরা রাজ্য প্রশাসনের সাথে যারা যুক্ত, তারা তো ২০১১ পরবর্তী বিভিন্ন ভাবে হুমকি সংস্কৃতির মুখোমুখি হয়ে চলেছি। কিন্তু 'ভয়' এমন একটা মানসিক অনুভূতি, যা বৃদ্ধির একটা সীমা থাকে। একটা পর্যায়ে পৌঁছে তা কাটতে থাকে। বাংলায় এই অবস্থাটাকেই সম্ভবত বলা হয় 'দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া'। ভয় কাটানোর গতি একেক জনের ক্ষেত্রে একেকরকম হলেও বাহ্যিক উপাদানের প্রভাবে তা ত্বরান্বিত হয়। বেশ কিছুদিন হল এই রাজ্যের কর্মচারীদের ক্ষেত্রে তা ঘটতেও শুরু করেছে। আর এক্ষেত্রে বাহ্যিক উপাদান একদিকে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি পরিচালিত বহুমাত্রিক সাংগঠনিক উদ্যোগ এবং ধারাবাহিক সংগ্রাম আন্দোলনের কর্মসূচী। অপরদিকে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পরিসর বৃদ্ধি।

তিলোত্তমার বিচারের দাবিতে চলমান আন্দোলন তিন মাস অতিক্রম করলেও ক্লান্তিহীন। আন্দোলনের নতুন নতুন বাঁকে সরকার ও প্রশাসন দিশাহারা। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় পুলিশ প্রশাসনের ভূমিকা চ্যালেঞ্জের সামনে পড়ছে। খুনি-ধর্ষকদের স্বর্গরাজ্যে নির্ভয়ে অপরাধীরা বিভিন্ন জায়গায় একের পর এক ধর্ষণ ও খুন করে চলেছে। পুলিশ প্রশাসন নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছে। ফলে জনতার ক্রোধের বহিঃপ্রকাশে তারা পুলিশের প্রতি আস্থা হারাচ্ছেন। গণতন্ত্রের পক্ষে এ বিপজ্জনক প্রবণতা, অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জেদ বাড়ছে মানুষের। পুঞ্জিভূত ক্ষোভ ও ঐক্যবদ্ধ শক্তি জয় করছে ভয়কে। তাই হাজারো বাধা সত্ত্বেও জনগণের আন্দোলন আরও তীব্র হয়ে উঠছে, ছড়িয়ে পড়ছে। ২০১১ সাল থেকে এ রাজ্যে অসংখ্য অপরাধ শাসকদলের প্রত্যক্ষ মদতে হয়ে চলেছে। থ্রেট কালচারের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ছাত্র সংসদ নির্বাচন, মেডিকেল কাউন্সিল সঠিকভাবে পরিচালনার দাবিতে দ্রোহের আন্দোলন সংগঠিত হচ্ছে। কিন্তু শুধু হাসপাতাল নয়, গোটা বাংলার সমাজই রয়েছে শাসকদলের থ্রেট সাম্রাজ্যের অধীনে। শাসকদলের সাথে সরকারী আমলা, পুলিশ ও দুষ্কৃতীদের কুৎসিত আঁতাত মানুষ প্রতিনিয়ত প্রত্যক্ষ করছেন। বর্তমানে সরকার ও শাসকদলের গড়ে তোলা এমন মাফিয়ারাজের বিরুদ্ধে জমে থাকা ক্ষোভের বিস্ফোরণ ঘটছে। জনগণের স্বতঃস্ফূর্ততাকে ত্বরান্বিত করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে সংগঠিত প্রতিবাদ, যা শুরু হয়েছিল ঘটনার দিন আর জি কর হাসপাতালে। ১৪ আগস্টের 'রিক্লেইম দ্য নাইট' বা রাতের দখল কর্মসূচীতে সৃষ্টি হওয়া আন্দোলনের হাত ধরে এসেছে নারী স্বাধীনতা, সমানাধিকারের দাবি। প্রতিবাদের এত ধরনও এককথায় অনবদ্য। শাসকদল আন্দোলনকারীদের সরকার বিরোধী, রাষ্ট্র বিরোধী হিসেবেই দেখছে ও তদনুযায়ী মিথ্যা মামলায় জড়াচ্ছে। মানুষ এই রাজনৈতিক শক্তির বিরুদ্ধে লড়ছেন। এই আন্দোলনে ঝাণ্ডাবিহীন, অদলীয় রূপ থাকলেও আন্দোলন সম্পূর্ণ রাজনৈতিক। জনগণকে প্রতি ইঞ্চিতে ন্যায় বিচার চাইতে লড়তে হচ্ছে শাসকদল ও সরকারের বিরুদ্ধে। তাই এই লড়াইয়ের চরিত্র যে রাজনৈতিক, তা নিয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। তবে জনগণের বিপুল অংশগ্রহণের মঞ্চে তা দলীয় রাজনীতির ঊর্ধ্বে বৃহত্তর জনজাগরণ।

গত কয়েকবছর ধরে এই রাজ্যের মহিলারা নিরাপদ নন। এটা আমাদের কথা নয়, ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরোর তথ্যই এ কথা বলছে। হুমকি সংস্কৃতির আবহে বিকারগ্রস্ত ধর্ষকরাও নতুন করে শক্তি পাচ্ছে। নিজের কর্মস্থলেই আক্রান্ত ও নিহত হলেন একজন তরুণী চিকিৎসক। স্বভাবতই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে, এ রাজ্যের কর্মস্থলও কি নিরাপদ? আমাদের মহিলা সহকর্মীরা কি আকাঙ্ক্ষিত নিরাপত্তা বলয়ের মধ্যে কাজ করতে পারছেন? শারীরিক বা মানসিকভাবে অস্বস্তিকর এমন কোনো পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হচ্ছে না তো? চারিদিকের ঘটনাপ্রবাহে এই প্রশ্ন অনেক বেশি প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে।

সমাজে সচেতন নাগরিকের পাশাপাশি প্রশাসনের দায়িত্বশীল কর্মচারী হিসেবে সমস্ত অংশের কর্মচারীদের (স্থায়ী ও অস্থায়ী) নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার দাবিতে কর্মচারী সমাজ বদ্ধপরিকর। কর্মস্থলে মহিলাদের সবরকম নিরাপত্তা প্রদানের জন্য ১৯৯৭ সালে মহামান্য সুপ্রিম কোর্ট সুনির্দিষ্ট নির্দেশিকা (বিশাখা গাইড লাইন) তৈরি করে। পরবর্তীতে সেই নির্দেশিকা মেনে ২০১৩ সালে আইন (PoSH Act, 2013) কার্যকরী করা হয়। কিন্তু আমাদের রাজ্যে সব দপ্তরে বা বিভাগে এই আইন মেনে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি, কোথাও আনুষ্ঠানিকভাবে শুধুমাত্র একটি লোক দেখানো কমিটি গঠন করে রাখা হয়েছে। যার অর্থ মহিলা কর্মচারীরা উপযুক্ত নিরাপত্তা বলয়ের মধ্যে নেই, তাই এই আইন অনুযায়ী যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জোড়ালো করতেই হবে। শুধুমাত্র মহিলা কর্মচারীরা নন, পুরুষ সহকর্মীদেরও এই দাবিতে গলা মেলাতে হবে। ১১ থেকে ২২ নভেম্বর ২০২৪-এর মধ্যে রাজ্যের প্রতিটি অফিসে এই দাবিতে সোচ্চারিত হয়েছেন কর্মচারীরা। ২৫ নভেম্বর অফিসে কাজ করার সময় কর্মস্থলে মহিলা কর্মচারীদের নিরাপত্তার দাবি সম্বলিত ব্যাজ পরিধান করে জেলা শাসকের কাছে ডেপুটেশন এবং ২৬ নভেম্বর জেলা সদরে ও কলকাতায় ৩ ডিসেম্বর এই দাবির সাথে বকেয়া মহার্ঘভাতা সহ ১৩ দফা দাবি দাবি নিয়ে জনতার দরবারে হাজির হবে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির নেতৃত্বে কর্মচারী সমাজ।

২০১১ সাল পূর্ববর্তী সময়ে রাজ্যবাসী যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিল। পরবর্তী সময়ে পূর্ব

● ষষ্ঠ পৃষ্ঠার চতুর্থ কলমে

বিশাখা নির্দেশিকা সম্পর্কে কয়েকটি কথা

আমাদের দেশে কর্মক্ষেত্রে যৌন হেনস্থা রোধের জন্য সুপ্রীম কোর্টের বিশাখা নির্দেশিকা অনুযায়ী যে আইন তা রচিত হয় ২০১৩ সালে। সুপ্রীম কোর্টের ১৯৯৭ সালের নির্দেশিকার আলোকে ২০১৩ সালে কেন্দ্রীয় সরকার আইন প্রণয়ন করে। কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের যৌন হয়রানি প্রতিরোধ, নিষেধাজ্ঞা ও প্রতিকার আইন, ২০১৩ যাকে ইংরেজিতে বলা হয় The Sexual Harassment of women at work place (Preservation, Prohibition and Redressal) Act, 2013 সংক্ষেপে PoSH Act. 2013 দেশব্যাপী কার্যকরী করার প্রায় ১৫ বছর আগে মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে 'বিশাখা নির্দেশিকা' প্রনয়ন করা হয়। এই নির্দেশিকায় সরকারী ও বেসরকারী নিয়োগ কর্তার উপর একটি নিরাপদ কাজের পরিবেশ সুনিশ্চিত করার দায় চাপানো হয়।

১৯৯৭ সালে মহামান্য সুপ্রীম কোর্ট যৌন হয়রানি অভিযোগের প্রতিকারের জন্য একটি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার জন্য সরকারী ও বেসরকারী ক্ষেত্রে কাজ করা সংস্থাগুলির জন্য বাধ্যতামূলক করে বিশাখা নির্দেশিকা প্রণয়ন করে।

কিন্তু কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানির বিষয়ে এই বিস্তৃত নির্দেশিকা প্রণয়ন করতে সর্বোচ্চ আদালত কিভাবে উদ্বুদ্ধ হয়েছিল, সেই বিষয়ে বিশাখা নির্দেশিকার প্রেক্ষাপট সম্পর্কে অবহিত হওয়া প্রয়োজন।

এই আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিল ১৯৯২ সালে। রাজস্থানের ভাটেরি গ্রামের সামাজিক প্রকল্পের স্বাস্থ্য কর্মী ভানওয়ারী দেবী, যিনি রাজস্থান সরকারের নারী উন্নয়ন কর্মসূচীর (WDP) অধীনে কাজ করার সময় গণধর্ষনের শিকার হন। নারী উন্নয়ন কর্মসূচীর অংশ হিসেবে তার দায়িত্ব ছিল নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে, নারী শিক্ষা, নারীর ক্ষমতায়ন, বাল্য বিবাহ এবং কন্যা শিশু হত্যার বিরুদ্ধে সচেতনতা বোধ জাগ্রত করা। কর্মসূচীর অংশ হিসেবে তাঁর স্বাস্থ্যবিধি, পরিবার-পরিকল্পনা এবং মেয়েদের শিক্ষিত করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির প্রশাসনিক দায়িত্ব ছিল। পাশাপাশি, কন্যা ভ্রূণ হত্যা, যৌতুক এবং বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধেও তিনি সচেতক ভূমিকা পালন করেছিলেন।

রাজস্থানে বাল্য বিবাহের এক প্রাচীন সামন্ততান্ত্রিক প্রথা মেনে 'আখা তিজ' উৎসব সাড়ম্বরে প্রতিপলিত হয়ে আসে। কিন্তু সে বছর (৫ মে, ১৯৯২) ভানওয়ারী দেবী রামকরণ গজ্জরের ন'মাস বয়সী মেয়ের বিয়ে বন্ধ করার চেষ্টা করলে তাঁকে সামাজিক শাস্তির মুখোমুখী হতে হয়েছিল। ১৯৯২ সালের ২২ সেপ্টেম্বর ভানওয়ারী দেবীকে তাঁর স্বামীর সামনে পাঁচ জন দলবদ্ধভাবে ধর্ষণ করে। কিন্তু এই ঘটনা তার প্রতিবাদী কণ্ঠকে স্তব্ধ করতে পারেনি। তার প্রতিবাদী ভূমিকা অপরাপর অংশকে প্রভাবিত করে। রাজস্থান সরকারের পুলিশের ভূমিকা নিয়ে চারিদিকে বিক্ষোভ শুরু হয়। অবশেষে ১৯৯৩ সালের জানুয়ারি মাসে CBI তদন্তের দায়িত্ব নেয়। সারা রাজস্থান জুড়ে এর বিরুদ্ধে সর্বাত্মক আন্দোলন শুরু হলে ভৈরো সিং শেখাওয়াতের সরকার চরম অস্বস্তিতে পড়ে। প্রভাবশালীদের চাপে তদন্তের প্রক্রিয়া শ্লথ গতিতে চলে, উল্টোদিকে এর বিরুদ্ধে মানুষের সমাবেশ সর্বশক্তি দিয়ে আন্দোলন গড়ে তোলে। এই গণ আন্দোলনের প্রভাব দেশ ছাপিয়ে পৃথিবীর বহু দেশে ছড়িয়ে পড়লেও, মনুবাদী নীতিতে পরিচালিত বিজেপি সরকার সেদিন সরকারী কাজে কর্তব্যরত মহিলার পাশে না দাঁড়িয়ে ধর্ষকদের পাশে দাঁড়ায়। এমনকি, ১৯৯৬ সালে জয়পুরে গজ্জর বিজয় সমাবেশে অভিযুক্ত ৫ জনকে মালা পরিয়ে স্বাগত জানিয়ে বিজেপি বিধায়ক কানহাইয়া লাল মীনা ভানওয়ারী দেবীকে পতিতা বলে আক্রমণ করে, তাঁকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারার নিদান দেওয়া হয়। অভিযোগকারীদের বেকসুর খালাস দেওয়ার প্রশাসনিক প্রক্রিয়া শুরু হয়।

ভানওয়ারী দেবীর হয়ে সুপ্রিমকোর্টে বিশাখা সহ বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন বনাম রাজস্থান সরকার মামলায় দেখা যায় কর্মক্ষেত্রে এরকম অপরাধ রোধ করার কোনো প্রকৃত আইন নেই। ১৯৯৭ সালে সুপ্রিম কোর্ট কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের যৌন হয়রানি রোধে বিশাখা নির্দেশিকা জারি করে। ভারতের সংবিধানের ১৫ নং ধারা এবং আন্তর্জাতিক কনভেনশন CEDAW যা আসলে সব ধরনের লিঙ্গবৈষম্য নির্মূল করার এক আন্তর্জাতিক নির্দেশনামা, তা মেনে এই আইন করা হয়। সম্প্রতি, কর্নাটক হাইকোর্ট গিগ্ ওয়ার্কারদের জন্যও এই আইন কার্যকরী করার নির্দেশ দিয়েছে।

২০১৩ সালে বিশাখা নির্দেশ অনুযায়ী PoSH Act– 2013 কার্যকরী করতে হলে প্রতিটি কর্মক্ষেত্রে ইন্টারনাল কমপ্লেন্টস কমিটি গঠন করার কথা। প্রতিটি কমিটির মাথায় থাকবেন একজন মহিলা আধিকারিক। কমিটির ৫০ শতাংশের অধিক সদস্য হবেন মহিলা। রাজ্যস্তরের প্রতিটি জেলায় একইভাবে আঞ্চলিক বা লোকাল কমপ্লেন্টস কমিটি তৈরী করার কথা। কিন্তু দশ বছর পরেও বহু কর্মক্ষেত্রে এই কমিটি আজও গঠিত হয়নি। দেশে প্রায় ১৮ শতাংশ জেলায় এই কমিটি আছে। কিন্তু সেখানেও সব ধরনের কর্মক্ষেত্রে গুরুত্ব দিয়ে কমিটি গঠিত হয়নি। ২০২১ সালে জাতীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন বিভাগ এবং বেসরকারী সংস্থা যৌথ সমীক্ষায় দেখা যায় ভারতে মাত্র ৮ শতাংশ মহিলা এই আইন সম্পর্কে অবহিত। এরমধ্যে ১১ শতাংশ মহিলা লজ্জার খাতিরে নির্লিপ্ত থাকাই শ্রেয় মনে করেন। তারা মনে করেন বিষয়টি জানাজানি হলে সামাজিক হেনস্থার শিকার হতে হবে। কিন্তু এই সমাজে যা ব্যক্তিগত সমস্যা বলে আমরা মনে করি তার প্রেক্ষাপটে কাজ করে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী। লিঙ্গ বৈষম্যের রাজনীতি যা আর্থিক, সামাজিক, রাজনৈতিক বৈষম্যের আধারে নিহিত থাকে।

বিশাখা নির্দেশিকাগুলির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো একটি নিরাপদ কাজের পরিবেশ প্রদান করা। প্রতিটি নিয়োগকর্তার কর্তব্য কর্মরত প্রতিটি কর্মচারীর বৃদ্ধি ও সমৃদ্ধির জন্য একটি নিরাপদ কাজের পরিবেশ প্রদান করা। এতে মহিলা কর্মচারীদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার জন্য পর্যাপ্ত পদক্ষেপ নেওয়া এবং কর্মচারীদের মধ্যে কেউ যেন যৌন হয়রানির শিকার না হয় তা নিশ্চিত করা। কোন মহিলা কর্মচারীর যৌন হয়রানি বা দুর্ব্যবহার সংক্রান্ত কোন অভিযোগ পাওয়া গেলে নিয়োগকর্তাকে PoSH Act অনুযায়ী অনুসন্ধান করে যথাযথ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। অভিযোগ দায়ের করা নিয়োগকর্তার কর্তব্য। একটি অভিযোগ নিষ্পত্তি কমিটি গঠন করা বাধ্যতামূলক যাতে কর্মীদের অভিযোগগুলি যথাযথভাবে মোকাবিলা করা হয় এবং এই ধরনের অভিযোগ প্রক্রিয়ায় উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয়। যৌন হয়রানি এবং নারীদের নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়ে তার প্রতিষ্ঠানে সচেতনতা ছড়িয়ে দেওয়াও নিয়োগকর্তার অন্যতম দায়িত্ব।

আর জি কর হাসপাতালের নৃশংস ঘটনা প্রবাহের আবহে গত ১০ অক্টোবর ২০২৪ বিশ্বব্যাপী পালিত হয়েছে বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস। এবারের বিষয় ছিল কর্মক্ষেত্রে মানসিক স্বাস্থ্য। এই বিষয়ে চরম উদ্বেগ প্রকাশ করে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বা Wold Health organization বলেছে সামগ্রিক স্বাস্থ্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ মানসিক স্বাস্থ্য। মানসিক স্বাস্থ্য হলো সুস্থতার অন্যতম মানদন্ড যেখানে একজন ব্যক্তি তার নিজের ক্ষমতা উপলব্ধি করতে পারে। আইনি অধিকার থাকলেও অধিকাংশ কর্মক্ষেত্রে তা রক্ষিত হচ্ছে না। সেইকারণে নির্ভয়ে কথা বলার সুযোগ না পাওয়ায় কর্মক্ষেত্রে মানসিক চাপের শিকার হচ্ছেন বহু মানুষ।

দেশের শ্রমজীবী মানুষকে সংঘবদ্ধ হওয়ার অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখা এবং পশ্চিমবঙ্গে প্রায় প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে 'থ্রেট কালচার' এর বিষাক্ত পরিবেশ মানসিক স্বাস্থ্যের খারাপ অবস্থাকেই চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে।

তাই প্রয়োজন সামগ্রিক আন্দোলনের। যতদিন শুধুমাত্র আক্রান্ত ব্যক্তির ঘটনা হিসেবে দেখা হবে, ততদিন এই সামাজিক ব্যাধির থেকে উত্তরণ পাওয়া যাবে না। যে সামাজিক উত্তরণের মাধ্যমে এর সমাধান সম্ভব তা হল ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন। লিঙ্গ নির্বিশেষে সমস্ত ক্ষেত্রের যৌথ আন্দোলনও এক্ষেত্রে সহায়ক শক্তি। রাজ্যে ঘটে চলা ঘটনা প্রবাহে এই আইন কার্যকরী করার জন্য সোচ্চারে দাবি উত্থাপন সেই আন্দোলনেরই অংশ। সমাজের সচেতন নাগরিকের পাশাপাশি দায়িত্বশীল সংগঠনের কর্মী হিসেবে সমস্ত অংশের কর্মচারীদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার দায়বদ্ধতায় আমরা বদ্ধপরিকর। মহিলা কর্মচারীদের কর্মস্থলে নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার পূর্বশর্ত হল প্রশাসনের অভ্যন্তরে গণতান্ত্রিক পরিবেশ। তাই বিশাখা নির্দেশিকা বা PoSH Act 2013 অনুযায়ী মহিলা কর্মচারীদের নিরাপত্তা প্রসঙ্গটি সামগ্রিক কর্মচারী সমাজের নিরাপত্তার সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত।

আসুন, সকলে সম্মিলিত ভাবে এই অধিকার প্রতিষ্ঠায় নিজেকে যুক্ত করি। □

কেন্দ্রীয় কমিটি
রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি

প্রসঙ্গ ঃ এক দেশ এক ভোট

বিদ্যুত দাস

ভারতের গণতন্ত্র, বহুত্ববাদ ও যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে ধ্বংস করার লক্ষ্যে তৃতীয় মোদি সরকার সংসদে আগামী শীতকালীন অধিবেশনে (নভেম্বর-ডিসেম্বর '২৪) 'এক দেশ এক ভোট' বিল পাশ করাতে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ইতিমধ্যেই গত ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ এই বিলের অনুমোদন দিয়েছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা।

প্রসঙ্গত, লোকসভা ও বিধানসভা ভোট একই সঙ্গে করাতে গত ১ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের নেতৃত্বে একটি উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন কমিটি গঠন করে দ্বিতীয় মোদি সরকার, বাকি কমিটি সদস্যরা হলেন অমিত সাহ (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী), অধীর চৌধুরী (লোকসভার প্রাক্তন বিরোধী দলনেতা), গোলাম নবী আজাদ (রাজ্য সভার প্রাক্তন বিরোধী দলনেতা), এন কে সিং (পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের প্রাক্তন চেয়ারম্যান), সুভাষ চন্দ্র কাশ্যপ (লোকসভার প্রাক্তন সেক্রেটারি জেনারেল), হরিশ সালভে (প্রাক্তন সলিসিটর জেনারেল)। সঞ্জয় কোঠারী (প্রাক্তন ভিজিল্যান্স কমিশনার) এবং আমন্ত্রিত সদস্য ছিলেন অর্জুন রাম মেঘওয়াল (কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী)। কমিটির ৯ জনের মধ্যে সাতজনই বিজেপি ঘনিষ্ঠ। তাই তৎকালীন লোকসভার বিরোধী দলনেতা কংগ্রেসের অধীর চৌধুরী এই কমিটি থেকে নিজের নাম প্রত্যাহার করে নেন।

রামনাথ কোবিন্দ কমিটি রিপোর্ট তৈরির আগে ৬২টি রাজনৈতিক দলের কাছে মতামত চেয়েছিল। রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে ৪৭টি দল জবাব দিয়েছে। এই প্রস্তাবের পক্ষে সমর্থন জানিয়েছে ৩২টি রাজনৈতিক দল। কংগ্রেস, সিপিআই(এম), সিপিআই, আমআদমি পার্টি সহ ১৫টি রাজনৈতিক দল সুস্পষ্ট বিরোধিতা করেছে। গত ১৪ মার্চ, ২০২৪ দ্বিতীয় মোদি সরকারের অন্তিম লগ্নে ৮ খণ্ডের ১৮০০০ পাতার রিপোর্ট রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর কাছে জমা দেয় কোবিন্দ কমিটি। রিপোর্টের মাত্র ৩২১ পাতা প্রকাশ্যে আনা হয়েছে। জানানো হয়েছে আইন কমিশনও আলাদাভাবে একটি রিপোর্ট পেশ করবে। ধরে নেওয়াই যায় অভিন্ন নির্বাচন প্রক্রিয়ার পক্ষেই মত দেবে।

রামনাথ কোবিন্দ কমিটির সুপারিশ গ্রহণ করে প্রধানমন্ত্রী, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব জানিয়েছেন, এক দেশ এক ভোট, শাসন ব্যবস্থা উন্নত করবে। কালো টাকার ব্যবহার কমবে। বার বার ভোটের ফলে সরকারী প্রকল্প রূপায়ণে বাধা পড়ে, তাছাড়া ভোটের জন্য পুলিশি নিরাপত্তার জন্য খরচ সহ বিভিন্ন খরচের সাশ্রয় হবে। যদিও কত টাকা সাশ্রয় হবে তার পরিমাণ জানানো হয়নি। সরকার জানিয়েছে এই বিল কোনো রাজনৈতিক কারণে আনা হচ্ছে না, তাই তাড়াহুড়ো করা হবে না। তবে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী জানিয়েছেন বর্তমান সরকারের কার্যকালের মধ্যেই 'এক দেশ এক ভোট' কার্যকর করার প্রক্রিয়া শুরু হবে। তার জন্য রূপায়ণ কমিটি গঠিত হবে। সব ভোটের জন্য একটি অভিন্ন ভোটার তালিকা করা হবে। প্রথম দফায় লোকসভা ও বিধানসভার ভোট একসাথে হবে এবং দ্বিতীয় দফায় লোকসভা ও বিধানসভা ভোটের পর একশো দিনের মধ্যে পুরসভা ও পঞ্চায়েত নির্বাচন করাতে হবে। যদিও স্থানীয় স্তরে অর্থাৎ পঞ্চায়েত এবং পৌরসভা ভোটের দায়িত্বে রয়েছে রাজ্য নির্বাচন কমিশন। ইতিপূর্বে চমক দিতে লোকসভা নির্বাচনের পূর্বে মহিলা আসন সংরক্ষণ বিল সংসদে পাশ করালেও তা কবে থেকে কার্যক হবে তার কোনও নির্দিষ্ট সময় বলেননি, ঠিক তেমনি আগামী ২০২৯ সালে লোকসভা-বিধানসভা নির্বাচন একসাথে হবে কিনা তা নিয়ে সুস্পষ্ট আশ্বাস দিতে পারেনি কেন্দ্র।

কোবিন্দ কমিটির রিপোর্ট কার্যকরী করতে সংবিধানের ৮৩, ৮৫, ১৭২, ১৭৪, ৩২৫, ৩৫৬ ধারা সংশোধন করতে হবে এবং বদলাতে হবে ১৯৫১ সালের জনপ্রতিনিধিত্ব আইন। সংবিধানের ৮৩ ধারা, সংসদের দুই কক্ষের মেয়াদ, ৮৫ ধারা-রাষ্ট্রপতি দ্বারা, সংসদ ভেঙে দেওয়া প্রসঙ্গে, ১৭২ ও ১৭৪ ধারায় বিধানসভার মেয়াদ ও তা ভেঙে দেওয়া প্রসঙ্গে, ৩২৫ ধারা—সব ভোটের জন্য একটি অভিন্ন ভোটার তালিকা প্রণয়ন করা, ৩৫৬ ধারা রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করা প্রসঙ্গে। রিপোর্টে বলা হয়েছে, পৃথিবীর মধ্যে সাত দেশে 'এক দেশ এক ভোট' নিয়ম মেনে নির্বাচন হয়। কিন্তু যে সাতটি দেশের উল্লেখ করা হয়েছে (ফিলিপাইন্স, ইন্দোনেশিয়া, জাপান, জার্মানি, বেলজিয়াম, সুইডেন, দক্ষিণ আফ্রিকা) সেই দেশগুলি একটিও ভারতের মতো এত বড় আয়তন নয়, বৈচিত্র্যপূর্ণ নয় এবং ১৪৫ কোটি জনসংখ্যাও নয়, আসলে নির্বাচনী ব্যবস্থার মাধ্যমে স্বাধীনতার পর দেশে যে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ধ্বংস করার জন্য এই 'এক দেশ এক ভোট' ব্যবস্থা চালু করতে চাইছে। তবে স্বাধীনতার পর থেকে ১৯৬৭ পর্যন্ত দেশে এক যোগে লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচন হয়েছে। মাঝে ১৯৫৯ সালে ৩৫৬ ধারা প্রয়োগ করে অন্যায়ভাবে কেরালায় বামপন্থী ফ্রন্ট সরকারকে ভেঙে দেওয়া হয়। তার পরবর্তী সময় অসংখ্যবার দেশে ৩৫৬ ধারা প্রয়োগ করে বিভিন্ন সরকার ভেঙে দেওয়া হয়েছে। ১৯৬৮, ১৯৬৯ সালে অনেকগুলি সরকার ভেঙে যায়। ১৯৭০ সালে লোকসভা ভেঙে যায়। অদ্যাবধি হঠাৎ যদি কোনো সরকার ভেঙে যায়, তাহলে নির্বাচনের মাধ্যমে নতুন সরকার ৫ বছর মেয়াদ থাকছে। কিন্তু কোবিন্দ রিপোর্টে বলা হয়েছে, সরকার মাঝ পথে ভেঙে নির্বাচনের মাধ্যমে নতুন সরকার এলেও ৫ বছরের মেয়াদের অবশিষ্ট সময়ের জন্য সরকার থাকবে। এর মধ্যে দিয়ে দুটি বিষয় ঘটছে। প্রথমত 'এক দেশ এক ভোট' থাকছে না। দ্বিতীয়ত, গণতান্ত্রিক অধিকারের উপর আঘাত করা হচ্ছে—অর্থাৎ ভোটাররা ভোট দিয়ে সরকার নির্বাচন করলেও সেই সরকার পাঁচ বছর থাকবে না। প্রসঙ্গত ১৯৮৩ সালে নির্বাচন কমিশন, ১৯৯৯ সালে বাজপেয়ী সরকারের সময় এল. কে. আদবানী ও ২০১৭ সালে নরেন্দ্র মোদি এবং নীতি আয়োগ 'এক দেশ এক ভোটে'র বিষয় উত্থাপন করে। যদিও ১৯৪০ সালে এম. এস. গোলওয়ালকার এক বক্তৃতায় বলেছিলেন আর. এস. এস এক পতাকা, এক আদর্শ, এক নেতৃত্ব, এক ধর্ম সারা দেশে ছড়িয়ে দিতে চায়। তারা ভারতের তিন রংয়ের জাতীয় পতাকা মানে না। সেই ভাবনার অংশই 'এক দেশ, এক ভোট'।

'এক দেশ এক ভোট' বিল পাশ করাতে হলে এন. ডি. এ সরকারকে সংবিধানের ৩৬৮ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী লোকসভা ও রাজ্যসভা সদস্যদের দুই তৃতীয়াংশের সমর্থন প্রয়োজন। অর্থাৎ লোকসভায় ৫৪৩ জন সাংসদের মধ্যে ৩৬২ জন সাংসদের সমর্থন প্রয়োজন। কিন্তু এন. ডি. এ-র ২৯৩ জন সাংসদ আছে। এই কারণেই গত লোকসভা নির্বাচনে 'চারশো পার'-র আওয়াজ তুলেছিল বিজেপি। পাশাপাশি রাজ্যসভায় ২৪৫ জন সাংসদের মধ্যে ১৬২ জনের সমর্থন প্রয়োজন। কিন্তু এন.ডি.এ-র হাতে ১২১ জন সাংসদ রয়েছেন। বাকি সমর্থন কোথা থেকে আসবে? সেটা কোথাও বলা হয়নি। তাহলে কি সাংসদ কেনা-বেচা করে সেই সমর্থন আদায় করা হবে? এখানেই শেষ নয়, এক সাথে রাজ্যগুলির ভোট করাতে হলে দেশের অন্তত ১৫টি রাজ্যে এই বিল পাশ করাতে হবে, যা খুব সহজ হবে না।

কোবিন্দ রিপোর্টে বলা হয়েছে এক সাথে ভোট করলে অর্থের সাশ্রয় হবে। কিন্তু কিভাবে হবে বা কত পরিমাণ অর্থ সাশ্রয় হবে সেটা বলা হয়নি। এক সাথে নির্বাচন হলে ৪০ লক্ষ ইভিএম মেশিন এবং সমসংখ্যক ভিভি পাট মেশিন লাগবে। পাশাপাশি নির্বাচনী ব্যবস্থাপনা ও বিপুল সংখ্যক নির্বাচন কর্মী ও নিরাপত্তাকর্মী একই সঙ্গে প্রয়োজন। তার জন্য খরচ কম হবে না। একই সঙ্গে ভোটের জন্য কাজ আটকে থাকার যুক্তিও ধোপে টেকে না। বিরোধীদের দাবি কোনো রাজ্যে ভোট থাকলে মোদি সেই রাজ্যে ছয় মাস আগে থেকে গিয়ে বিভিন্ন প্রকল্পের উদ্বোধন বা শিলান্যাস করেন। সেক্ষেত্রে পঞ্চায়েত ও পৌরসভা নির্বাচনও বাদ যায় না। বিরোধীরা আরো দাবি করেছেন যে সাঙ্গাততন্ত্রকে খুশি করার জন্য মোদি সরকার বিপুল পরিমাণ কর্পোরেট কর, সম্পত্তি করে ছাড় দিয়েছেন। মকুব করেছেন হাজার হাজার কোটি টাকা অনাদায়ী ঋণ। তার ফলেই কোষাগার দুর্বল হয়েছে। আসলে বার বার নির্বাচনে বিপুল অর্থ ব্যয়ের অজুহাত তুলে কেন্দ্রীয় শাসকদল চাইছে 'ওয়ান নেশন নো ইলেকশন' কার্যকর করতে।

ইতিপূর্বে মোদি সরকারের স্বৈরাচারী পদক্ষেপ দেশবাসী প্রত্যক্ষ করেছে। যেমন, এক দেশ এক ভাষার নামে হিন্দি চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছিল। দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলির তীব্র বিরোধিতায় মোদি সরকার পিছু হটে। 'এক দেশ এক ট্যাক্স'-র নামে 'জিএসটি' কার্যকর করা হয়েছে। যদিও অনেক রাজ্য মাঝে মাঝেই অভিযোগ করে রাজ্যের প্রাপ্য অর্থ দেওয়া হচ্ছে না। এক দেশ এক শিক্ষানীতির নামে জাতীয় শিক্ষানীতি অনেক রাজ্যে কার্যকর করা হয়েছে। এছাড়াও ২০১৪ থেকে ২০২৪ সময়কালে রামমন্দির নির্মাণ, নোটবন্দী, ৩৭০ ধারার বিলোপ, নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন এবং ন্যায় সংহিতা কার্যকর করেছে। সম্প্রতি জম্মু-কাশ্মীরে বিধানসভা নির্বাচনে ৩৭০ ধারা বিলোপের বিরুদ্ধে ভোট দিয়ে বিজেপিকে পরাজিত করেছেন সেই রাজ্যের ভোটাররা। বিরোধী দলগুলির পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, ভারতের সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বৈচিত্র্যময়তায় অন্তর্ঘাত চালানোর লক্ষ্যে এবং ভারতকে রাষ্ট্রপতি প্রধান দেশে পরিণত করার জন্য 'এক দেশ এক ভোট' শ্লোগান তোলা হয়েছে এবং যারা জম্মু-কাশ্মীর, হরিয়ানা, মহারাষ্ট্র, ঝাড়খণ্ড রাজ্যের নির্বাচন একসাথে করাতে পারে না তারা কিভাবে সারা দেশে একসাথে ভোট করাবে?

গত লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির আসন কমে যাওয়ায় মোদির অজেয় ভাবমূর্তি ধাক্কা খেয়েছে। ওয়াকফ সংশোধনী বিল সংসদে পাশ হয়নি, জেপিসিতে পাঠাতে বাধ্য হয়েছে সরকার। অন্যদিকে আকাশ ছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধি, বেকারত্ব, কৃষকদের সমস্যা,। অর্থনীতি বেহাল অবস্থা থেকে মানুষের নজর ঘোরাতে 'এক দেশ এক ভোট' সামনে আনা হয়েছে। একই সঙ্গে বর্তমান দেওয়ানি বিধি বৈষম্যমূলক আখ্যা দিয়ে আর এস এস-এর দীর্ঘদিনের দাবি 'অভিন্ন দেওয়ানি বিধি'র পক্ষে প্রচার চালাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী। ইতিমধ্যেই বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে নিজেদের মতো করে অভিন্ন দেওয়ানিবিধি কার্যকর করার উদ্যোগ নিয়েছে।

বর্তমান পরিস্থিতিতে 'এক দেশ এক ভোট' মডেলটির মাধ্যমে হিটলারি কায়দায় শাসন প্রতিষ্ঠা করতে চায় কেন্দ্রের শাসক দল। যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে এবং গণতন্ত্রকে সুরক্ষিত রাখতে একসাথে ভোট সংবিধান বিরোধী। হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির বেড়াজালে বন্দী করতেই 'এক দেশ এক ভোট'কে সামনে আনা হয়েছে। যে শাসকদল ভারতকে গণতন্ত্রের জননী বলে দেশ বিদেশে ঢক্কা নিনাদ করে তারাই আজ ভারতের গণতন্ত্র, বহুত্ববাদ ও যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ধ্বংস করতে চাইছে এক দেশ এক ভোটের নামে। ঐক্যবদ্ধভাবে সমস্ত গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষকে এর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সামিল হতে হবে। □

একটি অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ ধারণা ঃ কুরেশি

('এক দেশ এক ভোট' সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগকে এভাবেই বিবৃত করেছেন দেশের প্রাক্তন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার এস ওয়াই কুরেশি। ১৮ অক্টোবর ২০২৪ প্রকাশিত ফ্রন্টলাইন পত্রিকায় একটি সাক্ষাৎকারে তিনি 'এক দেশ এক ভোট' বিষয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা বলেছেন। আনন্দ মিশ্রের নেওয়া এই সাক্ষাৎকারটি এখানে মুদ্রিত হল। ভাষান্তর ঃ মানস কুমার বড়ুয়া)

এক দেশ, এক ভোট' এই ধারণার অনুকূলে খুবই সামান্য ভিত্তি আছে, বরং ভারতীয় প্রেক্ষাপটে এই ধারণাকে উল্লেখযোগ্য চ্যালেঞ্জের সামনা সামনি হতে হবে এবং এটি গভীরভাবে ত্রুটিপূর্ণ একটা ধারণা। ফ্রন্টলাইন পত্রিকাকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে এমন মত পোষণ করেছেন প্রাক্তন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার এস ওয়াই কুরেশি।

তিনি বলেন, ''যে দেশে প্রতিটি রাজ্যের রাজনৈতিক গতিপথ এক একটি নিজস্বতা অনুসরণ করে চলে, সেখানে একপেশে নির্বাচন যুক্তরাষ্ট্রীয়তার উপর গুরুতর আঘাত হানবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যদি কোনো রাজ্যে কিছু বিধায়ক আনুগত্য পরিবর্তন করে সংখ্যাগরিষ্ঠাতা উল্টে দেয় তাহলে কী হবে? এই পরিস্থিতিতে একযোগে নির্বাচন কিভাবে অব্যাহত থাকবে?''

তিনি আরও বলেন, ''প্রথমত লোকসভার অকাল ভাঙনের ক্ষেত্রে 'এক দেশ এক ভোট' কিভাবে কার্যকরী হবে? আমরা কী তখন সব রাজ্যের বিধানসভাগুলি ভেঙে দেব? একটি গণতন্ত্রে অন্তর্বস্তুগত এবং ব্যবহারিক, উভয় দিক দিয়ে এটি অকার্যকর বলে মনে হয়।''

প্রাক্তন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার বলেন যে, লোকসভা এবং বিধানসভা নির্বাচনের ১০০ দিনের মধ্যে আলাদা করে পঞ্চায়েত নির্বাচন অনুষ্ঠিত করা একযোগে নির্বাচনের মর্মবস্তুর বিরোধিতা করছে। কারণ লোকসভা ও বিধানসভার একযোগে নির্বাচন স্থানীয় স্তরের প্রায় ৩০ লক্ষ নির্বাচিত প্রতিনিধিদের উপেক্ষা করবে। তিনি বলেন, ''একইভাবে প্রায় ৪০ লক্ষ অতিরিক্ত ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিনের প্রয়োজনীয়তা দারুণভাবে অর্থনৈতিক এবং সরঞ্জাম সংক্রান্ত প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে।''

কুরেশির মতে ঘন ঘন নির্বাচনও কিছু বাড়তি সুবিধা দেয়। এর মধ্য দিয়ে রাজনীতিবিদরা আরও দায়বদ্ধ হয় তৃণমূল স্তরে কাজের সুযোগ তৈরি করতে এবং স্থানীয়, আঞ্চলিক এবং জাতীয় ইস্যুগুলিকে আলাদা করার প্রসঙ্গে। তিনি বলেন, ''একযোগে নির্বাচন প্রক্রিয়া বাস্তবায়নের পরিবর্তেন পদ্ধতি নির্দিষ্টকরণের মাধ্যমে অর্থ বল, দীর্ঘ সময়কালীন নির্বাচনী প্রচার এইসব সমস্যাকে মোকাবিলা করা আরও বাস্তবসম্মত হবে।'' কুরেশি আরও বলেন, যে কোবিন্দ প্যানেলের গঠন প্রক্রিয়াটি সমস্যাযুক্ত ছিল, কারণ প্রাক্তন বা বর্তমান নির্বাচন কমিশনারগণ এবং আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলের নেতারা এতে অনুপস্থিত ছিলেন, অথচ তারাই সবচেয়ে বেশি ভুক্তভোগী এবং এই ধরনের পরিবর্তনের জন্য তারাই সম্ভবত সর্বোত্তম সুপারিশ করতে পারতেন। □

দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পরে

শ্রীলঙ্কায় প্রথমবারের জন্য বামপন্থী রাষ্ট্রপতি

সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা ও সমতার কথা বলা হয়। তামিল ভাষীদের দীর্ঘদিনের দাবি দেশের উত্তর ও পূর্ব অংশে, যেখানে তামিলভাষীর বসবাস বেশি সংখ্যায়, সেখানে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ করতে হবে। ক্ষমতায় আসার পর এন পি পি দ্রুত প্রাদেশিক নির্বাচন করার কথা বলেছে, যেটা ২০১৩ সালের পর হয়নি। দিশানায়েকে ঘোষণা করেছেন যে সে দেশে ১৯৭৮ থেকে চালু তত্ত্বাবধানমূলক রাষ্ট্রপতি শাসন বিলোপ করবেন। বর্তমান রাষ্ট্রপতি ইতিমধ্যে সংসদ ভেঙে দিয়ে নভেম্বর '২৪-এ সংসদীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত করার কথা ঘোষণা করেছেন। তত্ত্বাবধায়ক সরকারে মহিলা প্রধানমন্ত্রী করা হয়েছে হরিণী অমারাসূর্যকে।

বামপন্থী রাষ্ট্রপতির সামনে অনেক চ্যালেঞ্জ রয়েছে। সবার আগে আই এম এফ লোনের জট কাটানোর সমস্যা মোকাবিলা করতে হবে। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে জনগণের স্বার্থকে মর্যাদা দিয়েই তা করা হবে। ভারত সহ প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির সাথে সম্পর্কের পুনর্বিন্যাস তাঁকে করতে হবে। সর্বোপরি তাঁকে এটা বিবেচনায় রেখে কাজ করতে হবে যে, দেশের জনগণ রাষ্ট্রের দীর্ঘদিনের সমস্যা, যন্ত্রণার অবসানের প্রত্যাশায় তাঁকে নির্বাচিত করেছেন। জনগণের প্রত্যাশার মর্যাদা দেওয়াই শ্রীলঙ্কার প্রথম বামপন্থী রাষ্ট্রপতির সামনে বড় চ্যালেঞ্জ। □

মানস বড়ুয়া

ফিরে দেখা ঃ জন্মশতবর্ষে মৃণাল সেন

I cannot delibarately make a popular film. Indian audiences seek escape from their daily lives when they go to cinema—my subjects are too close to daily life for popular appeal. I have to find a way to put across the message more successfully. (In fact) I feel it is not enough to disturb the audience—it is necessary to act as an agent provocateur. A film must project contemporary attitudes.—Mrinal Sen (South China Morning Poot, Hong Kong, April 16, 1980)

প্রণব কর

এ কি! একে আপনারা সিনেমা বলেন না কি? এ তো আমার, আপনার কথা। 'ইন্টারভিউ'-ছবিতে জনৈক বাসযাত্রী যখন এই কথা বলছেন তার পরে পরেই 'ইনক্লাব জিন্দাবাদ' ধ্বনি শোনা যায়। এটাই আসলে মৃণাল সেনের সিনেমার সঠিক সংজ্ঞা। সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবন, সঙ্কট, তার বিরুদ্ধে লড়াই—এটাই মৃণাল সেনের সিনেমায় উঠে এসেছে বারে বারে।

মৃণাল সেনের জন্ম শতবর্ষে আমরা তার কিছু বিখ্যাত সিনেমা নিয়ে এখানে আলোচনা করব। মৃণাল সেনের সিনেমায় বারে বারে উঠে এসেছে দুর্ভিক্ষ, দারিদ্র, বেকারী এবং তার রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট, ভারতীয় সিনেমায় যে নব-তরঙ্গের সৃষ্টি হয়েছিল ১৯৫০-এর দশকে, তার অন্যতম পথিকৃত ছিলেন মৃণাল সেন। তাঁর ছবিগুলি সৃজনশীলতার নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করেছিল।

৭-৮ বছর বয়সেই চার্লি চ্যাপলিনের 'দি কিড' ছবিটি দেখে প্রভাবিত হয়েছিলেন। পরবর্তীতে 'ইস্থেটিক্স অফ সিনেমা' বইটি পড়ে সিনেমার ব্যাপারে উৎসাহিত হন। কাকদ্বীপের কৃষক আন্দোলনের উপর একটি সিনেমা করবেন বলে ঠিক করেন। মৃণাল সেন লেখেন চিত্রনাট্য, তাপস সেন থাকেন ক্যামেরায় আর পরিচালনা করবেন ঋত্বিক ঘটক। কিন্তু শেষপর্যন্ত এই পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হয়। পরবর্তীতে 'রাত ভোর' নামে একটি সিনেমা পরিচালনা করলেও তিনি এই সিনেমার গুণমান নিয়ে নিজেই নিজের অপছন্দের কথা জানান এবং নিজেকে সরিয়ে নেন।

তাঁর প্রথম সফল ফিল্ম 'নীল আকাশের নীচে'। মহাদেবী ভার্মার ছোট গল্প ''চিনি ফেরিওয়ালা''। '১৯৩০' সালের প্রেক্ষাপটে ছবিটি তৈরি হয়। একজন সৎ চীনদেশীয় ফেরিওয়ালা ওয়াংলু কলকাতায় সিল্কের কাপড় বিক্রি করতে এসে এখানকার একজন আইনজীবীর স্ত্রী বাসন্তীর সঙ্গে পরিচিত হন যিনি স্বদেশী আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন। বাসন্তী কারারুদ্ধ হলে ওয়াংলুও রাজনীতিতে জড়িয়ে পরেন। ১৯৩১ সালে চীন জাপান আক্রমণ করলে ওয়াং লু দেশে ফিরে যায় প্রতিরোধ গড়ে তুলতে। মৃণাল সেন বলেছেন যে এই ফিল্মের মধ্য দিয়ে তিনি দেখাতে চেয়েছিলেন আমাদের দেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম সারা বিশ্বজুড়ে যে ফ্যাসীজম বিরোধী গণতান্ত্রিক লড়াই গড়ে উঠছে তারই একটি অংশ। চীন-ভারত সীমান্ত-সংঘর্ষের সময় বইটি সাময়িকভাবে নিষিদ্ধ হয়, তবে পরবর্তীতে মুক্তি পেয়ে বাণিজ্যিক ভাবেও সাফল্য পেয়েছিল। যদিও মৃণাল সেন ফিল্মটি সম্পর্কে পরে নিজে বলেছিলেন যে ফিল্মটিতে বেশ কিছু ভুল-ত্রুটি আছে। এটা তার কাছে অনেকটা ড্রেস রিহার্সালের মতো ছিল।

তাঁর তৃতীয় ছবি 'বাইশে শ্রাবণ'। লেখক চিদানন্দ দাশগুপ্ত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে বাংলায় যে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল তার প্রেক্ষাপটে একটি পুরুষ ও একটি নারীর সম্পর্ক, একটি স্বামী ও স্ত্রীয়ের সম্পর্ক নিয়ে ফিল্মটি তৈরি হয়। দুর্ভিক্ষ নিয়ে ফিল্মটি তৈরি হয়নি। দুর্ভিক্ষের মধ্যে দিয়ে—একটা সঙ্কটের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে মানবিক সম্পর্কগুলির কিভাবে অপমৃত্যু ঘটে তা দেখানো হয়েছে ফিল্মটিতে। সামাজিক সঙ্কটের মধ্য দিয়ে যেতে মানুষ কিভাবে তার সৌজন্য, সহৃদয়তা, সংবেদনশীলতা নষ্ট করে ফেলে তাই ফুটিয়ে তোলা হয়েছে এই ছবিতে। তিনদিন ধরে না খেয়ে থাকার পর যখন কিছুটা চাল যোগাড় হয়, তার পুরোটাই খেয়ে ফেলে প্রিয়নাথ, অভুক্ত স্ত্রীর কথা মনে থাকে না তার। যে স্বামী তার দিকে সর্বদা লক্ষ্য রাখতো, তার এই পরিবর্তন বিধ্বস্ত করে দেয় স্ত্রীকে। আসলে পুরুষ এবং নারীর সম্পর্কও আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি ও রাজনীতি বহির্ভূত নয়। একটা নিষ্ঠুর সময়ের নিষ্ঠুর ছবি 'বাইশে শ্রাবণ'।

নর-নারীর সম্পর্ক নিয়ে তাঁর আরেকটি ফিল্ম হল 'আকাশ কুসুম'। আশীষ বর্মনের একটি গল্পকে সম্পূর্ণ নতুনভাবে লিখে ছবিটি তৈরি হয়। একটি নিম্ন-মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে অজয় একটি ধনী পরিবারের মেয়ে মনিকার সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে তুলতে নিজেকে একজন সফল ব্যবসায়ী বলে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করে। কিন্তু শেষপর্যন্ত তার পরিচয় ফাঁস হয়ে যায়। ফলে, প্রেমিকার বাবা অজয়কে বের করে দেয় বাড়ি থেকে। অথচ তার আগে পর্যন্ত নিখুঁত সম্পর্ক গড়ে উঠেছে তাদের মধ্যে। বিয়ের পরে কিভাবে বাড়ি সাজাবে মনিকা, তা পর্যন্ত ঠিক হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু শ্রেণীবিভক্ত সমাজে প্রেমও একটি পণ্য যাকে কিনতে হয় নগদ মূল্য দিয়ে, প্রেমের সম্পর্কও আসলে অর্থনীতি-রাজনীতি নিরপেক্ষ কোনো ব্যাপার নয়, এই ফিল্মে সেটাই ফুটিয়ে তুলেছেন মৃণাল সেন। এই সিনেমাতে কোনো আবেগঘন পরিস্থিতি তুলে ধরতে মৃণাল সেন ফ্রিজ শটের ব্যাপক ব্যবহার করেছেন।

শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় একটি সাক্ষাৎকারে মৃণাল সেনকে তাঁর ফিল্ম তৈরির টেকনিক, ছবিতে শব্দ ও আলো ব্যবহারের টেকনিক নিয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন যে, তার জীবনের থেকেই তিনি এর ব্যবহারগুলো শিখেছেন। কলকাতায় আসার পর তিনি দেখেন মিউনিসিপ্যালিটির কর্মীরা ভোরবেলায় জলের পাইপ দিয়ে রাস্তা ধুয়ে দিচ্ছে। জলের পাইপগুলি ব্যবহারের সময় ক্লিক, ক্লিক করে শব্দ হত। ঐ শব্দ শুনে তিনি বুঝতে পারতেন যে রাস্তা ধোয়া হচ্ছে। আইজেনস্টাইনের বিখ্যাত নির্বাক ছবি ব্যাটেলশিপ পোটেমকিনের একটি দৃশ্যে ধর্মঘটী শ্রমিকদের ছত্রভঙ্গ করার জন্য হোসপাইপ দিয়ে বরফের মতো ঠাণ্ডা জল ঢালা হচ্ছিল। ঠিক তখনই তিনি যেন শুনতে পারেন হোসপাইপের ক্লিক, ক্লিক শব্দটি। সিনেমা আসলে একটি টেকনোলজিক্যাল পারফরমেন্স। সাউন্ড টেকনিক, লাইটের টেকনিক এবং সর্বশেষ এডিটিং—এর মধ্য দিয়ে একটা ফিল্ম তৈরি হয়। তিনি মন্তাজের ব্যাপারে কিছু জানতেন না। আইজেনস্টাইনের সিনেমা দেখে তিনি মন্তাজ তৈরি করতে শেখেন। কনস্ট্রাকটিভলি কাটিং এবং এডিটিং, কাটিং এবং জয়েনিং—এটাই মন্তাজ। একক প্রচেষ্টায় ফিল্মের এই টেকনোলজিক্যাল ব্যাপারগুলি তিনি শেখেন।

ঐ সাক্ষাৎকারে তিনি আরও জানান যে তিনি রাজনীতিবিদ নন, কিন্তু রাজনীতিটি তিনি বোঝেন। এবং রাজনীতির বাইরে গিয়ে কোনো সিনেমাও করা যাবে না। যে কোনো সম্পর্কের ক্ষেত্রে, নর-নারীর সম্পর্ক হোক বা মানুষে-মানুষে সম্পর্ক হোক—তা কখনোই রাজনীতির বাইরে নয়।

বনফুলের গল্প নিয়ে তিনি তৈরি করেন 'ভুবন সোম' ছবিটি। কোনো সরলরৈখিক গল্প নেই ছবিটিতে। অনেকে মনে করেছেন একজন জবরদস্ত আমলা কিভাবে স্বাভাবিক হল এটিই এই সিনেমার প্রতিপাদ্য। মোটেই তা নয়। একজন আমলাকে পরিবর্তিত করা এই সিনেমার উদ্দেশ্য ছিল না। আসলে দেখানো হয়েছে পরিবর্তিত পরিবেশে একজন আমলা কিরকম অনুভব করে। দূর গ্রামে শিকারে এসে ভুবন সোমের সঙ্গে একটি অল্পবয়সী মেয়ের সাক্ষাৎ হয়, যে তাকে শিকারের স্থানে নিয়ে যাবে। মেয়েটির ভূমিকায় অভিনয় করেন সুহাসিনী মূলে। সুহাসিনীকে মৃণাল সেন বলেন, শিকারের চূড়ান্ত মুহূর্তে আলতো করে ভুবন সোমের পিঠে হাত রাখতে। সুহাসিনী পরে জিজ্ঞাসা করেন যে, ভুবন সোমের সঙ্গে মেয়েটির সম্পর্ক কিরকমের? মৃণাল সেন জানান যে সিমপ্যাথেটিক। সুহাসিনী আবার জানতে চান যে কিরকমের সিমপ্যাথেটিক—ফেলো সিমপ্যাথেটিক না সেক্সুয়াল সিমপ্যাথেটিক। মৃণাল সেন উত্তর দেন দু'ধরনের মিশ্রণে গড়ে ওঠা একটা সম্পর্ক। সিনেমাটির জন্য প্রথম দিকে কোনো প্রযোজক পাওয়া যাচ্ছিল না, ফলে এফ এফ সি-এর কাছ থেকে মাত্র দেড় লক্ষ টাকা নিয়ে তিনি সিনেমাটি তৈরি করেন। সিনেমাটি শৈল্পিক দিক এবং বাণিজ্যিক দিক উভয় দিক থেকেই সাফল্য পায়। পরবর্তীতে বোম্বাইয়ের প্রযোজকরা তার বাড়িতে বারে বারে সিনেমা করার অফার নিয়ে আসতেন। কিন্তু তিনি একটি অফারও গ্রহণ করেননি। তার বদলে 'ইন্টারভিউ'-এর মতো একটি এক্সপেরিমেন্টাল সিনেমা করেন।

মৃণাল সেনের ক্যালকাটা ট্রিলজির প্রথম সিনেমা হল 'ইন্টারভিউ'। কাফকার গল্পের মতো, এই সিনেমায় একটি চাকুরীপ্রার্থী যুবকের সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত একটি দিনের ঘটনা নিয়ে তৈরি সিনেমা। বের্টোল্ড ব্রেখটের মেটা-রিয়েলিজমের প্রয়োগ ঘটানো হয়েছে এই সিনেমায়। অর্থাৎ এখান পরিচালক প্রথমেই বলে দেন যে তারা যেটা দেখছেন সেটা বাস্তব নয়, বরং বাস্তবের একটা প্রতিফলন মাত্র। সিনেমার মূল চরিত্র প্রথমেই সেটা জানিয়ে দেন।

একটি যুবক একটি বিদেশী সংস্থায় ইন্টারভিউ দেবে বলে সকালে লন্ড্রীতে যায় তার স্যুটটা আনবে বলে। গিয়ে দেখে সেদিন সকাল থেকে সব লন্ড্রীর দোকানে ধর্মঘট ডেকেছে। ফলে সারাদিন সে ছুটে বেড়ায় বিভিন্ন জায়গায় একজোড়া স্যুটের জন্য। শেষপর্যন্ত এক বন্ধুর কাছ থেকে তা যোগাড় করা গেলেও সেটি বাসে খোয়া যায় পকেটমারকে ধরতে গিয়ে। ফলে আর কোনো জামা-কাপড় না পেয়ে ধুতি-পাঞ্জাবী পরে ইন্টারভিউ দিতে যায় বিদেশী সংস্থায়। যথারীতি চাকরিটি যুবক পাননি। সমস্তরকম যোগ্যতা সত্ত্বেও শুধুমাত্র একজোড়া স্যুটের অভাবে চাকরিটা হয় না রঞ্জিতের। দিনের শেষে ক্রুদ্ধ রঞ্জিত একটি দোকানের শোকেসে সাজানো স্যুট পরিহিত মূর্তিটির পোষাক ছিড়ে ফেলে। শোকেস ভাঙার জন্য যখন রঞ্জিত একটি ইটের টুকরো তুলে নেয় হাতে, পিছনে জনতার চিৎকার শোনা যায় 'ইনক্লাব জিন্দাবাদ' বলে।

এরপরের বছর অর্থাৎ ১৯৭২ সালে মৃণাল সেন তৈরি করলেন তার অন্যতম বিখ্যাত সিনেমা—'ক্যালকাটা ৭১'। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রভাত কুমার সান্যাল এবং সমরেশ বসুর তিনটি ছোটো গল্প নিয়ে তৈরি হয় সিনেমাটি। প্রবোধ মৈত্রের সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকারে মৃণাল সেন বলেন যে, "I strongly fee that I, as a social being, am committed to my own times. I simply cannot escape it. And since poverty, famine and social injustice are dominant of my own times, my business as a film-maker is to understand them. I try to understand my own period. I try to put it across. এই সিনেমাটি মৃণাল সেনের অন্যতম Agit-prop. cinema। প্রথম গল্পটিতে সময়কালে কাজই দেখানো হয় একটি নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের প্রায় ভেঙে পড়া টালির চাল থেকে বৃষ্টি পড়ে সারা ঘর ভিজছে। বৃষ্টিতে

একটি কুকুর ঘরে ঢুকে পড়ার চেষ্টা করলে গৃহকর্তা লাঠি নিয়ে বৃষ্টির মধ্যেই কুকুরটিকে তাড়া করেন, বৃষ্টির তোড়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই টালির চালের একটা অংশ ভেঙে পড়লে পুরো পরিবারটি বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচতে একটি দালান বাড়ির বারান্দায় আশ্রয় নেয় আরও অনেক পরিবারের সাথে। মেয়েটি সেখানে ঐ তাড়িয়ে দেওয়া কুকুরটিকেও দেখতে পায়। এভাবেই দারিদ্র্যের প্রকোপে মানুষ আস্তে আস্তে মনুষ্যত্বর জীবে পরিণত হয়ে যেতে থাকে।

দ্বিতীয় গল্পটির সময়কাল ১৯৪৩ সাল। নলিনাক্ষ একজন সরকারী কর্মচারী, দিল্লীতে কর্মরত, বাংলায় কয়েকদিন কাজের জন্য এসেছে। দেখা করতে গেল তার পিসী আর পিসতুতো ভাই-বোনদের সঙ্গে। দুর্ভিক্ষের পরিস্থিতিতে নিজেদের বাড়ি বিক্রি করে দিয়ে একটি ভাড়া বাড়িতে উঠে এসেছে তার পিসি। সেখানে থাকতে থাকতে নলিনাক্ষ জানতে পারে দারিদ্র্যের কবলে পড়ে তার পিসি তার দুই মেয়েকে দেহ ব্যবসায়ে নামিয়েছে। এক ছেলেকে চা-এর দোকানে কাজে লাগিয়ে সেখানে খাবার চুরি করতে বাধ্য করেছে। মা আর মেয়ের তীব্র ঝগড়াতে বাস্তবের রূঢ় সত্যগুলি মুখোমুখি এসে দাঁড়ায়। দুর্ভিক্ষ কিভাবে মানুষের স্বপ্নগুলিকে শুকিয়ে ফেলেছে, মর্যাদাবোধকে ধূলিসাৎ করে দিয়েছিল তার প্রতিফলন ঘটেছে এই সিনেমায়।প রবোধ কুমার সান্যালের 'অবক্ষয়' গল্প অবলম্বনে ছবিটি তৈরি হয়েছিল। দুর্ভিক্ষ শুধু খাদ্যের আকাল নয়, দুর্ভিক্ষ মানে মানুষের স্বপ্নগুলির অপমৃত্যু, তার মর্যাদার অবনমন।

তৃতীয় গল্পের সময়কালে আরও এক দশক পরে। সারা দেশজুড়ে চলছে খাদ্য সঙ্কট, গ্রামীণ নিম্নবিত্ত পরিবারের বড় ছেলেটি শহরে চাল চোরাচালানের কাজে নেমে পড়তে বাধ্য হয় পারিবারিক দারিদ্র্যের জন্য। ট্রেনে চাল নিয়ে যখন গৌরাঙ্গ এবং তার সাঙ্গপাঙ্গরা যাচ্ছে, তখন ট্রেনের যাত্রীদের সঙ্গে গণ্ডগোল বাধে গৌরাঙ্গদের। একজন ধনী এবং বলশালী যাত্রী গৌরাঙ্গকে মারধর করে। পরে যখন সেই ব্যক্তি দুটি বড়ো মিষ্টির হাঁড়ি নিয়ে ট্রেন থেকে নামতে যায়, গৌরাঙ্গ পা বাড়িয়ে দিয়ে লোকটিকে স্টেশনে ফেলে দেয়। সঙ্গের মিষ্টির হাঁড়ি দুটিও ভেঙে যায়। আসলে দুটি শ্রেণীর মধ্যেকার চিরন্তন লড়াই, বিরোধিতাটিই ফুটে উঠেছে সিনেমাটির মধ্য দিয়ে।

এরপরে অভিজাত সম্প্রদায়ের মানুষদের একটি ককটেল পার্টির দৃশ্য দেখা যায়। এরা সাধারণ মানুষের অসুবিধা নিয়ে অনেক আলোচনা করে কিন্তু তা আসলে সম্পূর্ণ ভণ্ডামী, সাধারণ মানুষের জ্বালা যন্ত্রণা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন একটা অংশ। এদের মধ্যে একজন দার্শনিকের মতো বলতে থাকেন, আমি দেখতে পাচ্ছি new India is being born। একটা নতুন জাতি তৈরি হচ্ছে, এই বক্তব্য যখন তিনি রাখছেন তখনই পর্দায় ফুটে উঠছে অসংখ্য ক্ষুধার্ত শিশুর। অনাহারে অপুষ্ট শিশুর অন্তহীন কান্না, গোঙানি। সিনেমাটির শেষ দৃশ্যে দেখা যায় ২০ বছরের একটি ছেলে পুলিশের তাড়া খেয়ে ছুটে পালাচ্ছে শহর থেকে গ্রামে, জঙ্গল থেকে জনপদে। ছুটতে ছুটতে সে বলতে থাকে, জানাতে থাকে—আমার কি অপরাধ জানেন? আমি দেখেছি, সব দেখেছি, অত্যাচার, অবিচার, অন্যায়, সব দেখেছি। যুগ যুগ ধরে, হাজার বছর ধরে। আমার এই কুড়ি বছর বয়স নিয়ে আমি দেখেছি, দেখছি। বাইরে ঝড় বাড়ছে। বাতাস, চাপা একটানা সা সা শব্দ, আমার মনে হল কে যেন ক্রুদ্ধ নিঃশ্বাস ফেলে বলছে, আজ বাঁচলে, কিন্তু কাল? কাল কি করবে? পরশু? তারপরের দিন? আমি বাইরে এসে দাঁড়ালাম। অন্ধকার, শুধু অন্ধকার, অনন্ত অন্ধকার। মনে হল এই গ্লানি, এই অপমান, এই মৃত্যুর গভীর থেকে গুমরে গুমরে উঠছে একটি ভাষা, একটি প্রতিবাদ। যেন কৈফিয়ত তলব করছে। কতকাল আর কতকাল? শেষ দৃশ্যে যুবকটিকে গুলি করে মারা হয়। আর তারপরেই শোনা যায় ওয়াল্টার কফম্যানের অল ইন্ডিয়ার রেডিওর জন্য তৈরি করা সিগনেচার টিউন যা দিয়ে রেডিওর প্রতিদিনের ভোরের কর্মসূচীর সূচনা হত। এক অবশ্যম্ভাবী ভোরের প্রতিক্ষায় উঠে দাঁড়ায় দর্শকমণ্ডলী।

ক্যালকাটা ট্রিলজির শেষ ছবি 'পদাতিক'। মৃণাল সেন বলেছেন সত্তরের দশকের সূচনাতেই ফ্যাসিজমের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছিল। নেহরুর ভাষায় বললে, বর্বরদের পদধ্বনি। ঠিক তখনই মৃণাল সেন বন্দুকটা তাক করলেন নিজেদের দিকে। বামপন্থী দলগুলির মধ্যে একনায়কতন্ত্রী চিন্তাভাবনার প্রসার হচ্ছে কিনা, সমালোচনা করার গণতান্ত্রিক পরিবেশ সঙ্কুচিত হচ্ছে কিনা তার একটা আত্মসমীক্ষায় অগ্রসর হলেন তিনি। 'পদাতিক' সিনেমা সেইরকমই একটা আত্মসমীক্ষা। আশীষ বর্মনের লেখা কাহিনী নিয়ে ফিল্মটি তৈরি হয়। অতি বাম রাজনৈতিক দলের সদস্য সুমিতকে পুলিশ এনকাউন্টার থেকে বাঁচাতে বিজ্ঞাপনী বিপনন সংস্থার সঙ্গে যুক্ত শীলা নামক এক মহিলার এপার্টমেন্টে গোপন আশ্রয়ে রাখা হয়। দলের অল্পবয়সী সদস্য বিমান তাকে সেখানে নিয়ে আসে। সুমিতের বাবা বামপন্থী রাজনৈতিক দলের সদস্য ছিলেন। অসুস্থ স্ত্রীকে পরিচর্যা করেন, রান্নাবান্না করে অফিস করেন। ছেলের অতি বাম মতাদর্শ নিয়ে তর্ক হয়। ছেলেকে বলেন, বলশেভিকদের কথা আমরাও বলেছি, বিপ্লবের কথা আমরাও জানতুম, লেনিনের বই পড়েছি। কোথায় ছিলে তোমরা সব তখন? সুমিত অভিজাত পরিবেশে আরামদায়ক জীবন কাটাতে থাকে, কিন্তু সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে। এই অবস্থায় সে দলের বেশ কিছু রাজনৈতিক অবস্থান নিয়ে নতুন করে চিন্তা করার সুযোগ পায়। তার মনের মধ্যে অনেক প্রশ্ন ভীড় করতে থাকে। বিমানকে সে বলে, তুমি দেখতে পাচ্ছ না, দেখতে পাচ্ছ না আমাদের সামনে কোনও প্রোগ্রাম নেই? আচ্ছা বিমান, তুমি দেখতে পাচ্ছ না আমরা শূন্যে ঝুলছি, ভ্যাকুম, ব্ল্যাঙ্ক? বিমান বলে, সুমিত দা, আজ আপনি সাময়িকভাবে এখানে আটকে পড়ে আছেন। বেড়াবার পথ নেই। যোগাযোগ বন্ধ, বিচ্ছিন্ন। তাই আপনার এই ফ্রাস্টেশন। সুমিত চেঁচিয়ে ওঠে—এনাফ। ঐ এক বাধা বুলি শিখেছ। ফ্রাস্টেশন, ডিফিটিজম, পলায়নবৃত্তি। এটা আমার প্রশ্ন। এতদিন আমি করতে পারিনি, করতে জানতাম না। আজ আমি করছি। বিচ্ছিন্ন! স্বাভাবিকভাবেই তার এইসব প্রশ্নের ফলে সুমিত নেতৃত্বের বিরাগভাজন হয়ে ওঠেন, দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। শীলা সুমিতকে প্রশ্ন করে, দল আপনাকে চায় কী? সুমিত বলে ওঠে, দল তো কারুর ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়, লড়াই করতে হয়, ভেতরে-বাইরে। শীলা বলে ওঠে, আপনি একা। সুমিত বলে, এখন। একদিন আমিও বিমানের মতো ছিলাম। প্রশ্ন করতে জানতাম না। প্রশ্নহীন, চিন্তাহীন ক্যাননফডার। বিমান একদিন রাতে খবর দিয়ে যায় সুমিতের মা খুবই অসুস্থ। শীলা তার গাড়ি করে সুমিতকে তার বাড়ির কাছে ছেড়ে দিয়ে যায়। বলে সে অপেক্ষা করবে। সুমিত তাকে ফিরে যেতে বলে। বাড়িতে পৌঁছে সুমিত দেখে মা মারা গিয়েছেন। বাড়িতে বেশ কিছু লোকজন, তার বাবা তাকে সাবধান করে, তাকে চলে যেতে বলে। নাহলে যেকোনো সময় পুলিশ চলে আসবে। বাবাকে ছুঁয়ে সুমিত আবার পথে নেমে পরে পশ্চহীন আনুগত্য, বিলাসী জীবনকে ফেলে। সবকিছু আবার নতুন করে শুরু করতে হবে, একজন প্রকৃত বিপ্লবী হয়ে উঠতে হবে। পদাতিক একটি নির্দিষ্ট স্থান ও কালের ছবি হয়ে ওঠার বদলে তার মতাদর্শগত প্রশ্ন তোলার মধ্য দিয়ে এক চিরন্তন সময়ের সিনেমা হয়ে ওঠে।

ক্যালকাটা ট্রিলজিতে মৃণাল সেনের উপর গোদারের ছবির প্রভাব দেখা যায়। ফ্রিজ শটের ব্যবহার, জাম্প কাট, হাতে করে ক্যামেরা নিয়ে শট তোলা, কিংবা সরলরৈখিক গল্প বলার অভ্যাস ভেঙে ফেলার মধ্যে এই প্রভাব চোখে পড়ে।

১৯৭৭ সালে তামিল সিনেমা 'ওকা ওরি কথা' করলেন মৃণাল সেন। মূল গল্প প্রেমচাঁদের 'কফন'। উত্তরপ্রদেশের পটভূমিতে লেখা দারিদ্র্যের গল্প। মৃণাল বুঝলেন বাংলার পটভূমিকায়। আর ফিল্ম তৈরি করলেন অন্ধ্রপ্রদেশের পটভূমিকায়। আসলে দারিদ্র একটা আন্তর্জাতিক ঘটনা। ফলে যেকোনো পটভূমিতে তাকে দেখানো হোক না কেন, তা বুঝতে কোনো অসুবিধা হয় না। ছবিটি কান্স ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে দেখানো হলে, আর্জেন্টিনার বিখ্যাত চিত্র পরিচালক সোলানাস সেখানে ছবিটি দেখে বলেন যে ছবিটি তার কাছে অত্যন্ত পরিচিত লেগেছে। কারণ পৃথিবীর সর্বত্র দারিদ্র্য একইরম। সর্বত্র দারিদ্র্যের রং এক।

এর পরবর্তীতে মৃণাল সেন মধ্যবিত্ত পরিবারগুলির আপোষ, ভণ্ডামী উন্মোচিত করতে লাগলেন 'একদিন প্রতিদিন', 'খারিজ', 'চালচিত্র' ইত্যাদি সিনেমাগুলিতে। এই সিনেমাগুলির প্রতিনিধিত্ব করে অবশ্যই 'একদিন প্রতিদিন'। কলকাতার একটি ভাড়া বাড়িতে বাস করা এক পরিবারের একটি মেয়ে সন্ধ্যার পরে কাজ থেকে ফিরে এলো না। সে পরিবারের একমাত্র উপার্জনশীল সদস্য। পরিবারটি আতঙ্কিত হয়ে পড়ল, থানায় খবর জানালো। গভীর

● ষষ্ঠ পৃষ্ঠার চতুর্থ কলমে

প্রথম পৃষ্ঠার পরে

তিলোত্তমার ন্যায় বিচারের দাবিতে জনচেতনা মঞ্চের আহ্বানে প্রতিবাদ কর্মসূচী

রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক শাখা। এরপর ১২ই জুলাই কমিটির অন্যতম যুগ্ম আহ্বায়ক সুমিত ভট্টাচার্য বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারী কর্মচারী, শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী ও বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ব সংস্থার শ্রমিক-কর্মচারীরা মিলে জনচেতনা মঞ্চ তৈরি করেছেন। আর জি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে এই মঞ্চ তৈরি হয়েছে। প্রশাসনের সর্বত্র আজ জঞ্জাল জমেছে। এই জঞ্জাল থেকে

প্রশাসনকে মুক্ত করতে হবে।

এরপর গণনাট্য সংঘের সাম্প্রতিক শাখার পক্ষ থেকে সঙ্গীত পরিবেশন করা হয়। তারপর বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী অনুষ্ঠান পরিচালনার ভার বিশিষ্ট নাট্য পরিচালক অদৃজা দাশগুপ্ত ও অভিনেত্রী অর্পিতা দে-র হাতে অর্পণ করেন। প্রথমে আট্যম কলাক্ষেত্র একটি নৃত্যানুষ্ঠান পরিবেশন করে। তারপর কবি সূর্য মণ্ডল একটি স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করেন। তারপর 'রুটি ও গোলাপ' সংস্থা ''আর নহি সামান্যা নারী'' নামে একটি নাটক পরিবেশন করে।

এরপর আর জি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে তিনজন বিশিষ্ট চিকিৎসক বক্তব্য রাখেন। প্রথমে বক্তব্য রাখেন ডাঃ অরিন্দম ভট্টাচার্য। তারপর বক্তব্য রাখেন ডাঃ পবিত্র গোস্বামী ও ডাঃ গোপাল দাস।

এরপর প্রখ্যাত মহিলা পুরোহিত নন্দিনী ভট্টাচার্য ও তাঁর সঙ্গীরা মন্ত্রোচ্চারণ ও সঙ্গীতের মধ্যে দিয়ে ''শুভমণ্ডু ওঁ ফট স্বাহা'' নামক একটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন। তারপর রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন করেন বিশিষ্ট শিল্পী সুব্রত সেনগুপ্ত। পরবর্তীতে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের স্পন্দন শাখার পক্ষ থেকে ''বাবা তুমি ঘুমিয়ো না'' নামে একটি নাটক পরিবেশনের মাধ্যমে তিলোত্তমার হত্যাকাণ্ডের ঘটনাকে তুলে ধরা হয়।

এরপর কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান জানানো হয়। প্রথমে বক্তব্য রাখেন ইতিহাসবিদ মধুশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়। তারপর বক্তব্য রাখেন প্রখ্যাত নাট্যব্যক্তিত্ব মেঘনাদ ভট্টাচার্য। তারপর মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন-এর পক্ষে ডঃ অমিতাভ ভট্টাচার্য বক্তব্য রাখেন। এরপর বক্তব্য রাখেন মাধ্যমিক শিক্ষকদের পক্ষে সুকুমার পাইন।

এরপর মধুমিতা সেন ও মধুমিতা পাল একটি নৃত্যানুষ্ঠান পরিবেশন করেন।

মঞ্চে বিভিন্ন অনুষ্ঠান চলাকালীনই মঞ্চের নীচে অঙ্কনশিল্পীরা ক্যানভাসের ওপর তাঁদের প্রতিবাদ ফুটিয়ে তোলেন। তাঁদের মধ্যে বিশিষ্ট শিল্পী সনাতন দিন্দাও ছিলেন। ছিলেন বিশিষ্ট অঙ্কন শিল্পী মনীশ দেব। এরপর আবৃত্তি পরিবেশন করেন বিবি চ্যাটার্জী। তারপর আবৃত্তি পরিবেশন করেন বিজয়লক্ষ্মী বর্মন।

এরপর বিশিষ্ট আইনজীবী বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, ধর্ষণ কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। এর পেছনেও একটা দর্শন কাজ করে। তদন্ত ঠিকমতো এগোতে গেলে আমাদের আন্দোলন চালিয়ে যেতে হবে। আমরা চুপ করে গেলে তদন্তও থেমে যাবে।

এরপর ডঃ তমোনাশ ভট্টাচার্য বক্তব্য রাখেন। তারপর প্রাচ্য নাট্যগোষ্ঠী 'ইনক্লাব' নামে একটি নাটক পরিবেশন করে। এরপর বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও প্রাবন্ধিক শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় বক্তব্য রাখেন। পরবর্তীতে ডঃ তমোনাশ চৌধুরী ডক্টর ফর ডেমোক্রেসি-র পক্ষে বক্তব্য রাখেন।

এরপর প্রখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী কাজী কামাল নাসের সঙ্গীত পরিবেশন করেন। তিনি শ্রোতাদেরও তাঁর সাথে গলা মেলাতে অনুরোধ করেন।

এরপর কয়েকজন শিল্পী, অভিনেতা ও বিশিষ্ট ব্যক্তিরা মঞ্চে ওঠেন। তাঁদের মধ্যে কয়েকজন বক্তব্যও রাখেন। প্রথমে বক্তব্য রাখেন অভিনেত্রী মানসী সিনহা। অভিনেতা চন্দন সেনও সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। অধ্যাপক শ্যামল চক্রবর্তী ও অধ্যাপক অম্বিকেশ মহাপাত্রও সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। অভিনেতা জ্যাকও সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। তারপর উপস্থিত ছিলেন অভিনেতা দেবদূত ঘোষ, সৌরভ পালোধি, বাদশা মৈত্র সহ বহু বিশিষ্টজন।

এরপর প্রতিবন্ধী সংগঠনের পক্ষে বক্তব্য রাখেন অনির্বাণ মুখার্জী। লেখিকা ও শিক্ষাবিদ প্রতিভা সরকার বক্তব্য রাখেন।

তারপর সবার মুখ সংস্থা 'ঝামেলা' নামে একটি নাটক মঞ্চস্থ করে। আবৃত্তি পরিবেশন করেন প্রখ্যাত আবৃত্তিকার রজত বন্দ্যোপাধ্যায়। বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক ও কবি কনিষ্ক ভট্টাচার্য। তিনি একটি কবিতাও আবৃত্তি করেন।

এরপর বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব ও অভিনেতা বিমল চক্রবর্তীকে কিছু বলবার জন্য অনুরোধ জানানো হয়। তিনি সংক্ষেপে তাঁর বক্তব্য রাখেন।

তারপর গীটার সহযোগে প্রতিবাদী গান পরিবেশন করেন ঋতবান গুহ। এরপর মূকাভিনয় করেন মধুরিমা গোস্বামী।

এরপর জনচেতনা মঞ্চের পক্ষে বক্তব্য রাখেন সন্দীপ দাস।

''জনতার দরবারে'' নামক অনুষ্ঠানটি সবশেষে পরিবেশিত হয়।

এই মহতী কর্মসূচী সন্ধে সাতটার মধ্যে শেষ করার কথা থাকলেও তা সম্ভব হয়নি। রাত সাড়ে আটটা পর্যন্ত এই কর্মসূচী চলে। শ্রোতারা ধৈর্য ধরে দীর্ঘ সময় ধরে এই কর্মসূচীতে উপস্থিত ছিলেন। বহু পথচলতি মানুষও অনুষ্ঠান দেখার জন্য রাস্তায় ভিড় করে দাঁড়িয়ে পড়েন। বক্তব্য না রাখলেও আরও কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি এই কর্মসূচীতে উপস্থিত ছিলেন। বিশিষ্ট চিকিৎসক ডঃ ফুয়াদ হালিম তাঁদের মধ্যে অন্যতম। □

ইন্দ্রজিৎ রায় চৌধুরী ও দেবাশীষ রায়

তৃতীয় পৃষ্ঠার পরে

কর্মস্থলে সম্মানজনক পরিবেশ রক্ষায় সংগ্রামই একমাত্র পথ

অভিজ্ঞতার সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী এক নতুন অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হচ্ছেন প্রতিদিন, প্রতিমুহূর্তে। গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধ করে রাজ্যজুড়ে সন্ত্রাস ছড়িয়ে জনগণ তথা কর্মচারী সমাজের মান সম্মান, অর্জিত অধিকার হরণ করা হচ্ছে। স্থায়ীপদে বা শূন্যপদে স্থায়ী নিয়োগ না করে অস্থায়ীভাবে নিয়োগ করছে এই স্বেচ্ছাচারী সরকার, যার ফলে বেকারী ক্রমবর্ধমান। এই সমস্ত আক্রমণের বিরুদ্ধে সাধারণ শুভবুদ্ধিসম্পন্ন জনগণ যেমন গর্জে উঠছে, তেমনি রাজ্যের কর্মচারী সমাজও সমস্ত ভয়-ভীতি কাটিয়ে জোড়ালো সংগ্রামে সামিল হচ্ছেন।

অভিজ্ঞতা বলছে, কর্মচারীদের আর্থিক ও অধিকারগত বঞ্চনার মাত্রা যত বৃদ্ধি পায়, সংগ্রাম-আন্দোলনের ফর্ম ও কন্টেন্ট-এর মাত্রাতেও ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটে। কর্মচারী সমাজের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ এবং সাংগঠনিক উদ্যোগ ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকায় সংগঠনের সর্বস্তরের কাঠামোয় জন্ম নেয় গভীর আত্মবিশ্বাস। এই আত্মবিশ্বাসই বৃহত্তর কর্মসূচী তথা আন্দোলনের সফলতম রূপ দিতে সাহস যোগায়। এই আত্মপ্রত্যয়ী সাহস ও মানসিক দৃঢ়তা নিয়েই সমস্ত ক্ষোভের স্রোত এমন আপন বেগে পাগল পাড়া। 'গুণ্ডা কন্ট্রোলে'র দক্ষতা দিয়ে এই ক্ষোভকে যে দমন করা যাবে না, তা বুঝিয়ে দিতে প্রস্তুত হচ্ছেন রাজ্যের সরকারী কর্মচারীরা। তারা আবারও প্রমাণ করবেন সংগ্রামই একমাত্র পথ। এই পথেই চিহ্নিত হবে সমাজের গণশত্রু, প্রশাসনের অভ্যন্তরে মহিলা কর্মচারীদের নিরাপত্তা প্রদান সহ গণতান্ত্রিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনা এবং ন্যায়সঙ্গত অর্জিত অধিকার রক্ষার লড়াইকে তীব্রতর করার শপথ নিয়েই বর্তমান পর্যায়ের সংগ্রাম আন্দোলন পরিচালিত হবে। আসুন, সুস্থ সমাজ গঠনের লক্ষে সেই সংগ্রামে নিজেকে যুক্ত করি। □

পঞ্চম পৃষ্ঠার পরে

ফিরে দেখা ঃ জন্মশতবর্ষে মৃণাল সেন

রাতে পুলিশ এসে জানিয়ে যায় নীলরতন হাসপাতালে একটি মেয়েকে ভর্তি করা হয়েছে, ট্রেন থেকে ঝাঁপ দিয়েছে। খুব সম্ভবত সন্তানসম্ভবা। বক্তব্যটা শুনে মেয়েটির বাবা আতঙ্কিত হয়ে পড়েন, মেয়েটির জন্য নয়, পরিবারের বদনামের ভয়ে। নীলরতনে যখন তারা অপেক্ষা করতে থাকেন, তখন তাদের সঙ্গে আরও বেশ কিছু পরিবারের লোকেরা অপেক্ষা করতে থাকে, তাদেরও বাড়ির মেয়েরা বাড়ি ফেরেনি। তাদের প্রত্যেকের কথায়ও সেই একই দুশ্চিন্তা ধরা পড়ে, পরিবারগুলি কী লজ্জার মুখোমুখি হবে। ভাড়া বাড়ির অন্য ভাড়াটিয়াদের মধ্যেও নানা জল্পনা চলে, মেয়েটির চরিত্র নিয়ে প্রশ্ন উঠতে থাকে, কিন্তু মেয়েটি কোনো বিপদে পড়ল কি না তা নিয়ে বিশেষ চিন্তা নেই। মেয়েটির মা পর্যন্ত আতঙ্কিত হয়ে পড়েন, মেজো মেয়ের সঙ্গে ঝগড়ায় জড়িয়ে পড়েন। মেজ মেয়ে মায়ের কাছে জানতে চায় তিনি সত্যি করে তার বড় মেয়ের কথা কখনও ভেবেছে কি না। তারপরে বলে তারা কেউই দিদির জন্য কিছু ভাবেনি। আসলে দিদিকে, তার রোজগারটাকে তাদের সকলের দরকার ছিল। দিদিকে তারা ভুলে যাবে। এ পাড়ায় তাদের কোনো দায় থাকবে না। এ বাড়ি তো তাদের ছাড়তেই হবে। গভীর রাতে মেয়েটি বাড়ি ফিরে আসে। পরিবারের সকলে কঠিন মুখে তাকে দেখতে থাকে। আর বাড়িওয়ালা ওপর থেকে নেমে এসে চিৎকার করে বলতে থাকে যে এ বাড়ি ছেড়ে দিতে হবে, কারণ এটা ভদ্রলোকের বাড়ি, ভদ্রলোকের পাড়া। ভদ্রলেকের মুখোশের আড়ালে একটি মেয়েকে কুৎসিৎভাবে আক্রমণ করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা হল না বাড়িওয়ালটির। আসলে মেয়েদের সম্বন্ধে মধ্যবিত্ত পরিবারগুলিতে, সমাজের মধ্যে সে ধারণাগুলি প্রোথিত হয়ে রয়েছে তা অত্যন্ত নিচুস্তরের। ওপরে একটা প্রগতিশীলতার প্রলেপ থাকলেও, সময় সুযোগ পেলেই নিচু চিন্তাভাবনাগুলি প্রকাশিত হয়ে পড়ে। এ প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে পদাতিক সিমেনায় মহিলা সমাজ কর্মীদের একটি আলাপচারিতা ছিল, সেখানে তারা বলে ওঠেন যে সমাজ ব্যবস্থার সঙ্গে মেয়েদের অবস্থাটা এমন ওতপ্রোতভাবে জড়িত যে সমাজ ব্যবস্থা না পাল্টালে মেয়েদের মুক্তি হবে না।

মধ্যবিত্তের সুবিধাবাদী মানসিকতা, আর ভণ্ডামি আরও জোরালোভাবে উন্মোচিত হয়েছে 'খারিজ' সিনেমায়। রমাপদ চৌধুরী লিখিত 'খারিজ' উপন্যাস অবলম্বনে সিনেমাটি তৈরি। মৃণাল সেন এক জায়গায় বলেছেন যে অনেকে তার কাছ থেকে জানতে চেয়েছেন এটি শিশু শ্রমিক সংক্রান্ত কোনো সিনেমা কি না। কিন্তু এটা তা নয়। শিশু শ্রম নিশ্চয়ই ভারতের ক্ষেত্রে একটা বাস্তবতা। কিন্তু এ বিষয়ে তিনি সিনেমাটি করতে চাননি। একটি দুর্ঘটনায় বাড়ির ১২ বছর বয়সী কাজের ছেলেটির মৃত্যু হয়। এই মৃত্যুর মধ্য দিয়ে তিনি মধ্যবিত্ত সমাজকে দেখবার চেষ্টা করেছিলেন। একটি আয়নার সামনে তাদের দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন।

ডিসেম্বরের তীব্র ঠাণ্ডায় এক মধ্যবিত্ত গৃহস্থ বাড়ির অল্পবয়সী কাজের ছেলেটি সিঁড়ির তলা ছেড়ে রান্নাঘরে শুতে যায় একটু উষ্ণতা পাবার জন্য। কিন্তু বদ্ধ ঘরে উনুনের মৃদু আঁচে তৈরি হওয়া কার্বন-মনো-অক্সাইডে ছেলেটির মৃত্যু হয়। সেই মৃত্যুর দায় এড়ানোর জন্য গৃহকর্তা এবং গৃহকর্ত্রী আপ্রাণ চেষ্টা চালাতে থাকে। গৃহকর্তা অঞ্জন সেন প্রতিবেশীকে সঙ্গে নিয়ে এক অ্যাডভোকেটের কাছে যান আইনী পরামর্শ নিতে। অঞ্জন সেন অ্যাডভোকেটকে জানান যে ছেলেটি তাদের বাড়ির লোকের মতোই ছিল। অ্যাডভোকেট বাধা দিয়ে বলেন যে ছিল না। যতটা সুযোগ সুবিধা গৃহকর্তারা অ্যাফোর্ড করেন, যা তাদের নিজের সন্তান পেয়েছে, তার কতটুকু ওই কাজের ছেলেটি পেয়েছে? ছেলেটির শোবার কোনো ঘর ছিল না, শুত সিঁড়ির তলায়, রান্নাঘরে। অ্যাডভোকেট আরও বলেন যে কলকাতার উপর দিয়ে এই যে কয়েকদিন কোল্ড ওয়েভ বয়ে গেল, কখনও কি অঞ্জনবাবু ভেবেছিলেন কাজের ছেলেটিকে একটি বাড়তি কম্বল দেবার কথা? ভাবেননি, কেউই ভাবে না। একবার ছেলেটি যখন অসুস্থ হয়ে পরে সিঁড়ির নিচে শুয়ে থাকতো, তার জন্য অঞ্জনবাবুর কোনোদিন কোনো অস্বস্তি হয়েছে কিনা তা জানতে চান অ্যাডভোকেট। এভাবেই মধ্যবিত্তের ভণ্ডামীর মুখোশ পরতে পরতে খুলে দেন মৃণাল সেন এই সিনেমায়।

চালচিত্র সিনেমাটি মধ্যবিত্ত মহিলাদের লড়াই নিয়ে করা। এই সিনেমার একটি দৃশ্যে একটি দেওয়ালে টানা অনেক পোস্টার দেখানো হয়। এই পোস্টারগুলি পশ্চিমবঙ্গ সাব-অর্ডিনেট ইঞ্জিনীয়ারিং সার্ভিস এসোসিয়েশন ও রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কর্মচারীদের দাবি-দাওয়া সংক্রান্ত পোস্টার।

১৯৮০ সালে অমলেন্দু চক্রবর্তীর গল্প অবলম্বনে তৈরি করেন 'আকালের সন্ধান'। একজন চিত্র পরিচালক অভিনেতা, অভিনেত্রীদের নিয়ে পশ্চিমবাংলার গ্রামে এসে উপস্থিত হন ১৯৪৩ সালের আকালের উপর সিনেমা নির্মাণ করার জন্য। কিন্তু পুনঃনির্মিত অতীত তাড়া করে বেড়ায় বর্তমানকে। বাংলায় দুর্ভিক্ষ হয়েছে বারে বারে। দুর্ভিক্ষ পীড়িত মানুষের ছবি দেখিয়ে বলা হয় কোনোটা ১৯৪৩ সালের, কোনোটা ১৯৫৯-এর, আবার কোনোটা বা ১৯৭১-এর দুর্ভিক্ষের ছবি। সিনেমার মধ্যে সিনেমা। ১৯৪৩-এর দুর্ভিক্ষকে ধরবার জন্য একটি পরিবারের গল্প বলা হয়। সাবিত্রী আর অর্জুন। খাদ্যের অভাবে সাবিত্রী দেহ ব্যবসায় নামতে বাধ্য হয়। কলকাতা থেকে আসা চালের ঠিকাদারদের কাছে নিজেকে বিক্রি করে সাবিত্রী কিছুটা চাল আর তেল যোগাড় করে আনে পরিবারের জন্য। অশক্ত অর্জুন ক্রুদ্ধ হয়ে ভাতের হাঁড়ি ভেঙে ফেলে আর নিজেদের শিশু সন্তানকে আছড়ে মেরে ফেলে। এই দৃশ্য দেখতে দেখতে ইউনিটের কাজের মেয়ে দুর্গা আতঙ্কে চিৎকার করে ওঠে। সিনেমা কোথাও বাস্তবকে ছেদ করে যায়। দুর্গারও স্বামী দুর্ঘটনার পর থেকে কাজে অক্ষম। দুর্গা বিভিন্ন বাড়িতে কাজ করে নিজের শিশু সন্তান ও স্বামীকে নিয়ে বেঁচে থাকার প্রাণপণ লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে যেতে যেতে সাবিত্রীর মধ্যে যেন নিজের ভবিষ্যতের ছবি দেখতে পায়। অতীতের মধ্যে বর্তমান দেখে ভবিষ্যতে ছবি। আসলে ১৯৪৫ সালের আকালের যে কারণগুলি, যে গ্রাম্য মাতব্বরেরা সেদিন আকালের সুযোগ নিয়ে গরিব মানুষদের জমি লুঠ করেছিল, তাদের সক্রিয় উপস্থিতি আবারও আকালের সম্ভাবনাকে জিইয়ে রাখে।

এরপরে 'খণ্ডহর', 'জেনেসিস', 'একদিন অচানক', 'অন্তরীণে'র মতো সব কালজয়ী সিনেমা করেছিলেন মৃণাল সেন। তাঁর শেষ সিনেমা 'আমার ভুবন'। দুঃখজনক ঘটনা হল তার অনেক ফিল্মের প্রিন্ট নষ্ট হয়ে গেছে সংরক্ষণের অভাবে।

এই লেখা শেষ করব মৃণাল সেন সম্পর্কে শাবানা আজমির একটি বক্তব্য দিয়ে—Mrinal Sen will continue to be relevant not because he spoke only of those times but he spoke in a way that was universal. And it's a sad fact that the issues that he raised in his films continue to haunt us today and not only in India, but in the world. □

প্রথম পৃষ্ঠার পরে

রাজ্য কাউন্সিল সভার আহ্বান

সিদ্ধান্ত অনুযায়ী চলমান সংগ্রাম-আন্দোলন পরিচালনার প্রয়োজনে সংগঠন তহবিল সংগ্রহের যে সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছিল, সামগ্রিক পরিস্থিতির নিরিখে তা আগামী নভেম্বর, ২৪ পর্যন্ত বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সংগঠনের সমস্ত কাঠামো সক্রিয় উদ্যোগ গ্রহণ করলে তবেই সর্বোচ্চ লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছানো সম্ভব। এই কাজে সমিতিগুলিকে যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে সহায়তা করতে হবে।

৫। বর্তমান সাংগঠনিক বছরে সদস্যভুক্তির যে ন্যূনতম লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হয়েছিল, বর্তমানে পরিস্থিতিজনিত ইতিবাচক বাস্তবতাকে ধারণ করে দ্রুত তা সম্পন্ন করতে হবে।

৬। কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যৌথ সাংগঠনিক সফরসূচী স্থগিত করা হলেও কয়েকটি জেলার উদ্যোগে ব্লকস্তর পর্যন্ত সফরসূচী সংগঠিত হয়। সংগঠনের অভ্যন্তরে কিছু ইতিবাচক প্রভাব পড়লেও সাংগঠনিক সক্রিয়তা বৃদ্ধি ও কর্মচারীদের সাথে নিবিড় যোগাযোগের লক্ষ্যে অন্তর্ভুক্ত সমিতির কেন্দ্রীয় সফরসূচী করা প্রয়োজন। এই বিষয়ে যথাযথ পরিকল্পনা সমিতিগুলিকে গ্রহণ করতে হবে।

৭। বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব সলিল চৌধুরী ও মৃণাল সেনের জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপনের কর্মসূচী (যে জেলায় হয়নি) দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।

২৬ নভেম্বর ২০২৪, অবস্থান বিক্ষোভের ১৩ দফা দাবিসমূহ ঃ

১। তিলোত্তমার দ্রুত ন্যায় বিচার এবং আর জি কর কাণ্ডে জড়িত ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে।

২। স্বাস্থ্য সহ সমস্ত প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে দুর্নীতি ও থ্রেট কালচার মুক্ত করতে হবে।

৩। কেন্দ্রীয় হারে প্রাপ্য বিপুল পরিমাণ বকেয়া মহার্ঘভাতা / মহার্ঘরিলিফ অবিলম্বে প্রদান করতে হবে।

৪। আবাস যোজনা সহ বিভিন্ন সামাজিক প্রকল্প রূপায়ণে অবাঞ্ছিত রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ বন্ধ করে সুস্থ পরিবেশ ও উপযুক্ত পরিকাঠামো সুনিশ্চিত করতে হবে।

৫। প্রতিটি সামাজিক প্রকল্পের সুফল প্রকৃত উপভোক্তাদের কাছে পৌঁছে দিতে হবে।

৬। কর্মস্থলে মহিলাদের শারীরিক ও মানসিক নিরাপত্তা বিধান সংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট আইনের (PoSH Act-2013) যথোপযুক্ত প্রয়োগ সুনিশ্চিত করতে হবে। রাজ্যের সর্বত্র মহিলাদের নিরাপত্তার প্রয়োজনে সাধারণ ও পুলিশ প্রশাসনের রাজনৈতিক পক্ষপাতহীন আদর্শ ভূমিকা পালন করতে হবে।

৭। রাজ্য প্রশাসনে সমস্ত শূন্যপদে স্বচ্ছ নিয়োগ পদ্ধতির মাধ্যমে স্থায়ী নিয়োগ করতে হবে। ইতিমধ্যে বিভিন্ন ধরণের প্রশাসনিক কাজে নিযুক্ত চুক্তিভিত্তিক ও অনিয়মিত কর্মচারীদের নিয়মিতকরণ করতে হবে।

৮। এযাবৎকাল প্রকাশিত সমস্ত হয়রানিমূলক, প্রতিহিংসাপরায়ণ ও আইন বহির্ভূত বদলীর আদেশনামা প্রত্যাহার করে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের পূর্ববর্তী স্থানে ফিরিয়ে আনতে হবে।

৯। অসাধু ব্যবসায়ী ও মজুতদারদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে মূল্যবৃদ্ধির সমস্যার সুরাহার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

১০। চিকিৎসা সংক্রান্ত ব্যয়ের ধারাবাহিক উর্ধ্বগতিকে বিবেচনায় রেখে স্বাস্থ্য প্রকল্পে ক্যাশলেস বেনিফিটের উর্ধ্বসীমা ৫ লক্ষ টাকা করতে হবে। স্বাস্থ্য প্রকল্পের সুযোগ প্রদানে বিভিন্ন বেসরকারী স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের টালবাহানা রোধে উপযুক্ত প্রশাসনিক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

১১। রাজ্য সরকারের অধীনে থাকা বিপুল জমি (ট্রাম কোম্পানীর জমি সহ) বেসরকারী উদ্যোগপতিদের হাতে তুলে দেওয়া চলবে না।

১২। বিদ্যুৎ মাশুলের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি রোধ করতে হবে। স্মার্ট মিটার ব্যবহার বন্ধ করতে হবে।

১৩। পশ্চিমবাংলার ঐতিহ্য অনুসারী গণতান্ত্রিক ও সম্প্রীতির পরিবেশ সুনিশ্চিত করতে হবে। □

দুই রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল

বিজেপি এবং নরেন্দ্র মোদি সরকারের সমস্ত নির্যাতন, নিপীড়নের জবাব গণতান্ত্রিক পথে দিলেন জম্মু-কাশ্মীরের মানুষ। একই সঙ্গে জম্মু-কাশ্মীরের মানুষের বার্তা দেশে ধর্মনিরপেক্ষতাকে মজবুত করার লড়াইতে তারা রয়েছেন সামনের সারিতেই। ৮ অক্টোবর ফল ঘোষণার পর কাশ্মীর সরকার গঠন করেছে ন্যাশনাল কনফারেন্স কংগ্রেস এবং বামপন্থীদের জোট। ১৬ অক্টোবর নতুন সরকারের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ নিয়েছেন ওমর আবদুল্লা। শ্রীনগরে এই শপথ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ফারুক আবদুল্লা, মল্লিকার্জুন খাড়গে, রাহুল গান্ধী, প্রকাশ কারাত, ভি রাজা, অখিলেশ যাদব, কানি মোঝি, সুপ্রিয়া সুলে প্রমুখ 'ইন্ডিয়া মঞ্চ'-র নেতৃবৃন্দ। জম্মুর নওসেরা কেন্দ্র থেকে বিজেপির জম্মু-কাশ্মীরের সভাপতি রবীন্দ্র রায়নাকে প্রায় ৮ হাজার ভোটে পরাজিত করা সুরিন্দর চৌধুরী উপমুখমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন। এছাড়াও সাকিলা মাসুদ, জাভেদ দার, সতীশ শর্মা ও জাভেদ রানা মন্ত্রী হিসাবে শপথ নিয়েছেন। বিজেপি গোটা নির্বাচন প্রক্রিয়াকে হিন্দু বনাম মুসলিম, জম্মু বনাম কাশ্মীর হিসাবে তুলে ধরেছিল। কিন্তু জম্মু-কাশ্মীরের মানুষ বিশেষত হিন্দুপ্রধান জম্মুর এক বৃহৎ অংশের মানুষ এই ধর্মীয় বিভাজনের রাজনীতির বিরুদ্ধে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছে। একই সঙ্গে নতুন মন্ত্রিসভা গঠনের মধ্য দিয়ে ন্যাশনাল কনফারেন্সের নেতা তথা ইন্ডিয়া মঞ্চের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা জম্মু ও কাশ্মীরের মানুষের কাছে এই বার্তাই দিয়েছেন বিভাজনের রাজনীতির কারবারিরা যতই চেষ্টা করুক জম্মু-কাশ্মীরের একতার প্রশ্নে জোট সরকার দায়বদ্ধ। জোটের অন্যতম শরিক দল কংগ্রেস সরকারের যোগ না দেওয়ার প্রশ্নে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি তারিক হাবিদ করেরা বলেছেন, আমরা মনে করেছিলাম রাষ্ট্রপতি শাসন প্রত্যাহারের পাশাপাশি জম্মু-কাশ্মীরের রাজ্যের মর্যাদাও ফিরিয়ে দেবে কেন্দ্র। সেই কাজ করা হয়নি। কেন্দ্রের এমন সিদ্ধান্তে আমরা অখুশি, তাই এখনই সরকারে যোগ দিচ্ছি না। শপথ গ্রহণের পর ওমর আবদুল্লা বলেছেন কংগ্রেসের সরকারে যোগ দেওয়ার রাস্তা খোলা রয়েছে, তাই কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের সীমিত মন্ত্রিসভায় তিনটি স্থান খালি রাখা হয়েছে।

৯০ আসনের জম্মু-কাশ্মীর বিধানসভায় ৪২ আসনে জয়ী হয় ন্যাশনাল কনফারেন্স। পাশাপাশি নির্দল হিসাবে জিতে আসা ৮ জনের মধ্যে ৪ জন ন্যাশনাল কনফারেন্সকে সমর্থন জানিয়েছেন। তারা ন্যাশনাল কনফারেন্স-এর বিক্ষুব্ধ ছিলেন। ফলে ন্যাশনাল কনফারেন্স একক ভাবেই সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ করেছে। এর সঙ্গে কংগ্রেসের ছয় জন ও সিপিআই(এম)-এর কুলগাম বিধানসভা থেকে পঞ্চমবার বিজয়ী ইউসুফ তারিগামিরও সমর্থন রয়েছে নবগঠিত সরকারের প্রতি। অপরদিকে কাশ্মীরে বিজেপি কোনও আসন পায়নি। ডিলিমিটেশনের নামে আসন বৃদ্ধি করা সত্ত্বেও হিন্দু প্রধান জম্মুতে ৪৩ আসনের মধ্যে বিজেপি মাত্র ২৯টি আসনে জয়ী হয়েছে। পিডিপি ৩টি আসন, আম আদমি ১টি আসন এবং পিপলস্ কনফারেন্সের সাজ্জাদ লোন একটি আসনে জয়ী হয়েছেন। ভোটে দলের বিপর্যয়কর ফলাফলের পরেও প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও পিডিপি নেত্রী মেহবুবা মুফতি বলেছেন, জম্মু-কাশ্মীরে মানুষ স্থায়ী সরকার গঠনের জন্য নির্ণায়ক রায় দেওয়ায় আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি। বিজেপি ও কেন্দ্রীয় সরকারের দিকে আঙুল তুলে তিনি বলেছেন, যদি স্পষ্ট রায় না মিলতো তাহলে এখানে সরকার গঠনের জন্য নানা ধরনের অপকৌশলের চেষ্টা করত। তিনি আরও বলেছেন এবারে যেন কেন্দ্রীয় সরকার জম্মু-কাশ্মীর সরকারকে সঠিকভাবে কাজ করতে দেয়, কোনোরকম হস্তক্ষেপ ছাড়া।

এই নিয়ে দ্বিতীয়বার জম্মু-কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী হলেন ওমর আবদুল্লা এবার যদিও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের। এর আগে ২০০৯ সাল থেকে ২০১৪ পর্যন্ত জম্মু-কাশ্মীর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন তিনি। ২০১৯-এর ৫ আগস্ট সংবিধানের ৩৭০ ধারাকে কার্যত বাতিল করে জম্মু-কাশ্মীর রাজ্যকে দুই টুকরো করে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে পরিণত করে মোদি সরকার। তখনই ঘোষণা করা হয়েছিল জম্মু-কাশ্মীরকে পরবর্তীকালে রাজ্যের মর্যাদা দেওয়া হবে, যদিও তা এখনও পর্যন্ত কার্যকরী করা হয়নি। তার আগে ২০১৪ সালে পিডিপি'র সঙ্গে জম্মু-কাশ্মীরে সরকার গঠন করেছিল বিজেপি। সেই সরকার ভেঙে দেওয়ার পর থেকে কেন্দ্রীয় শাসনে চলে যায় জম্মু-কাশ্মীর। দশ বছর পর জম্মু-কাশ্মীর বিধানসভা ভোট হল এবং পিডিপি-বিজেপি সরকারের পরে এই প্রথম স্থানীয় সরকার তৈরি হল।

২০১৯-এর ৫ আগস্ট ৩৭০ ধারা বাতিল এবং জম্মু-কাশ্মীরকে দুই টুকরো করে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করার পরবর্তী সময়ে গোটা কাশ্মীর উপত্যকায় বেনজির পরিস্থিতি তৈরি হয়। কাশ্মীর উপত্যকায় সমস্ত রাজনৈতিক নেতৃত্বকে গৃহবন্দী করে রাখা হয়। সিপিআই(এম)-এর কুলগামের বিধায়ক তথা পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য মহম্মদ ইউসুফ তারিগামি সঙ্গে সাক্ষাৎকারে তার শারীরিক অবস্থার বিষয়ে জানতে দিল্লী থেকে শ্রীনগর বিমানবন্দরে পৌঁছালে রাজ্যসভার সাংসদ তথা গোটা দেশের বামপন্থী ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতৃত্ব সীতারাম ইয়েচুরিকে আটকে রেখে পুনরায় ফেরত পাঠানো হয়। এ বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের দারস্থ হওয়ায় সুপ্রিম কোর্টের হস্তক্ষেপে রাজ্যসভার সাংসদ সীতারাম ইয়েচুরি শ্রীনগরে কুলগামের বিধায়ক ইউসুফ তারিগামির বাড়িতে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং চিকিৎসার জন্য তাকে দিল্লীতে নিয়ে আসেন। পরবর্তীতে মহম্মদ ইউসুফ তারিগামির মুখ থেকে সাংবাদিক সম্মেলনে গোটা দেশের মানুষ জানতে পারেন জম্মু-কাশ্মীরের মানুষের ওপর কি অবর্ণনীয় অত্যাচার ও নির্যাতন নামিয়ে এনেছে দেশের কেন্দ্রীয় সরকার। নির্বাচন ফলাফল প্রকাশের ঠিক পূর্বেই কুলগামের বিধায়ক ইউসুফ তারিগামি বলেছিলেন ৩৭০ ধারা বাতিল করে জম্মু-কাশ্মীর রাজ্যকে দুই ভাগ করে দুটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে পরিণত করার পরে এটাই প্রথম বিধানসভা নির্বাচন। এই নির্বাচন হচ্ছে এমন এক অঞ্চলে, যেখানে মানুষ সাংবিধানিক গ্যারান্টির ক্ষয় দেখেছে। সেখানে এই ভোট তাই গণতন্ত্রের পরীক্ষাও। জম্মু-কাশ্মীরের মানুষ তাদের আওয়াজ বুলন্দ করতে চান এবং স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরতে চান। আগামী দিনে এই অঞ্চল কিভাবে পরিচালনা করা হবে, তার মুখ্য নির্ধারক এই নির্বাচন। গণতান্ত্রিক অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং নাগরিক স্বাধীনতার জন্য মানুষের গভীর আশঙ্কা রয়েছে। একই সঙ্গে তারিগামি নির্দল হিসাবে জামাত-ই-ইসলামের প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে নিয়েও গুরুতর প্রশ্ন তুলে বলেছেন, দশকের পর দশক জামাত গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে পাপ কাজ বলে চিহ্নিত করেছে। তারা শুধুমাত্র নির্বাচনের নিন্দাই করেনি জনগণকে বলেছে এর থেকে দূরে থাকতে। কিন্তু হঠাৎ করেই তাদের এই অবস্থান পরিবর্তন নিয়ে গভীর পর্যালোচনার প্রয়োজন। জামাতকে জবাবদিহি করতে হবে কেন তারা মানুষকে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে, যা গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করেছে এবং গোটা কাশ্মীরের কবরস্থানগুলোকে ভরিয়ে তুলেছে। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে কুলগাম কেন্দ্রে তারিগামিকে পরাজিত করতে নির্দলের আড়ালে জামাতের প্রার্থী ছিল সায়র আহমদ রেশি, যিনি ৮ হাজারের বেশি ভোটে পরাজিত হয়েছেন।

বিধানসভা ভেঙে দিয়ে রাষ্ট্রপতি শাসক জারি, পরবর্তীতে ৩৭০ ধারা বাতিল করে জম্মু ও কাশ্মীরকে দু-টুকরো করে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে পরিণত করার পরে জম্মু-কাশ্মীরের এবারের নির্বাচন ছিল অভূতপূর্ব। কাশ্মীর উপত্যকায় সমর্থন প্রাপ্তির কোনও সুযোগ নেই বুঝে ইসলামি মৌলবাদী জামাত-ই-ইসলামি সহ বেশ কয়েকটি সংগঠনের সঙ্গে গোপন আঁতাত করে বিজেপি ও কেন্দ্র। 'দ্য সানডে গার্ডিয়ান' পত্রিকার এক প্রতিবেদনে এই ষড়যন্ত্রকে স্পষ্ট করা হয়েছিল। নয়ের দশকে কাশ্মীর উপত্যকায় সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ প্রসারে জামাতের ভূমিকা আছে। কিন্তু পুরনো অবস্থান থেকে ১৮০ ডিগ্রী ঘুরে তারা এবার দশটি কেন্দ্রে নির্দল প্রার্থী দাঁড় করায়। অর্থাৎ মোদি-শাহরা একদিকে জম্মুতে হিন্দুত্বের তাস খেলেছে, অন্যদিকে কাশ্মীরে ইসলামিক মৌলবাদ শক্তির সঙ্গে আঁতাত করেছে। বিজেপির হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির অংশ হিসাবে ৩৭০ ধারা বাতিল করে দেশজুড়ে কাশ্মীর নিয়ে ফায়দা তোলার চেষ্টার বিরুদ্ধে জম্মু কাশ্মীরের মানুষের অধিকার রক্ষার লড়াইয়ে অপরদিকে উগ্র মুসলিম মৌলবাদী শক্তির বিরুদ্ধেও আপসহীন লড়াইতে নেতৃত্ব দিচ্ছে ইউসুফ তারিগামি। কাশ্মীরে বিজেপি বিরোধী দলগুলোর মধ্যে সেতুবন্ধনের কাজ করেন তিনি। তাই কুলগাম আসনে তাকে পরাজিত করার জন্য জামাতের পক্ষ থেকে প্রচার করা হয়। ভোটে জামাতের প্রার্থী পরাজিত হলে ইসলামের পরাজয় হবে। কুলগামের ভোটকে ইসলাম বনাম কমিউনিজম বলেও প্রচার করে জামাত। জয়ী হওয়ার পর তারিগামি জানান তার জয় মানে ইসলামের পরাজয় নয়, এটা জামাতের ধর্মীয় ভাবাবেগকে কাজে লাগিয়ে রাজনৈতিক ফায়দা লোটার নীতির পরাজয়। জম্মু-কাশ্মীরের মানুষ একদিকে যেমন ৩৭০ ধারা বাতিল সহ বিজেপির বিভাজনের রাজনীতিকে পরাস্ত করেছেন, তেমনি ধর্মনিরপেক্ষ জোটকে জয়ী করে দিলেন ঐতিহাসিক জনাদেশ।

একইসঙ্গে অনুষ্ঠিত হওয়া হরিয়ানা বিধানসভার নির্বাচনে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের ভুল প্রমাণিত করে রাজ্যে তৃতীয় বারের জন্য সরকার গঠন করেছে বিজেপি। বিধানসভায় বিজেপি পেয়েছে ৪৮টি আসন, আর কংগ্রেস জয়ী হয়েছে ৩৭টি আসনে। যদিও ভোট শতাংশের নিরীখে পার্থক্য সামান্যই। বিজেপি পেয়েছে৩৯.৯৪ শতাংশ ভোট, কংগ্রেস পেয়েছে ৩৯.০৯ শতাংশ ভোট। ক্ষমতায় না এলেও ২০১৯ সালের নিরীখে ভোট শতাংশ এবং আসন সংখ্যার নিরীখে ভালো ফল করেছে কংগ্রেস। অন্য দুই প্রতিদ্বন্দ্বী আই এন এল ডি এবং জেজেপি এবার পর্যুদস্ত হয়েছে। হরিয়ানায় জুলানা কেন্দ্র এবারের ভোটে ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এই বিধানসভা কেন্দ্রে এবার কংগ্রেসের প্রার্থী ছিলেন বীনেশ ফোগট। যিনি মাস দুয়েক আগে মাত্র ১০০ গ্রাম বেশি ওজনের জন্য প্যারিস অলিম্পিকের চূড়ান্ত পর্যায় থেকে ছিটকে গেছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী মোদি দুঃখপ্রকাশ করে বার্তা দিয়েছিলেন সামাজিক মাধ্যমে, যেন তৈরিই ছিলেন। একসময় তাদের চোখে দেশদ্রোহী বীনেশকে সেদিন দেশের 'বেটি' বলতে মানতে হয়েছিল প্রধানমন্ত্রীকে। বীনেশ ফোগটের অপরাধ তিনি মোদির বিশ্বস্ত অনুচর যৌন হেনস্থায় অভিযুক্ত প্রাক্তন বিজেপি সাংসদ ব্রিজভূষণ শরণ সিংহের অপসারণ ও শাস্তি চেয়েছিলেন, যিনি দেশের কুস্তি ফেডারেশনের প্রধানের পদে ছিলেন। বীনেশকে জয়ের পর কদর্য আক্রমণ করে ব্রিজভূষণ বলেছেন 'ও জাঁহা জাঁহা জায়েগি, সর্বনাশ হি হোগা'। অর্থাৎ বীনেশ যেখানেই যাবেন সেখানেই সর্বনাশ হবে। যুক্তি হিসাবে তিনি বলেছেন বীনেশ জিতলেও কংগ্রেস তো হেরেছে। আর ফলাফল ঘোষণার পর বীনেশ বলেছেন, 'এই জয় প্রতিটি মেয়ের, প্রতিটি মহিলার'। এই জয় সেই আন্দোলনের জয়, সেই মেয়েদের জয়, যারা লড়াইয়ের ময়দান থেকে পিছু হঠতে নারাজ। রাজনৈতিক মহলের অভিমত বিরোধীদের মধ্যে অনৈক্য এবং নূহের সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী হিংসা থেকে ফায়দা লুঠে জয় হাসিল করেছে বিজেপি। □

দেবাশীষ রায়

মহিলা কর্মচারীদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার দাবিতে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির চিঠি

মাননীয় মুখ্যসচিব,
পশ্চিমবঙ্গ সরকার, নবান্ন, হাওড়া

বিষয় ঃ রাজ্য সরকার পরিচালিত, নিয়ন্ত্রিত ও পোষিত সমস্ত দপ্তর ও প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে কর্মরত মহিলা কর্মচারীদের শারীরিক ও মানসিক নিরাপত্তা এবং প্রকৃত লিঙ্গসমতা ভিত্তিক পরিবেশ সুনিশ্চিত করা প্রসঙ্গে

উল্লেখ ঃ বিশাখা ও অন্যান্য বনাম রাজস্থান সরকার ও অন্যান্য মামলায় প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন সুপ্রিম কোর্টের তিন সদস্যের বেঞ্চের রায় (তাং ১৩.০৮.১৯৯৭)

মহাশয়,

আপনি আবগত রয়েছেন যে, আমাদের দেশের সংবিধানের ১৪, ১৫ ও ২১ নং ধারায় 'লিঙ্গ সমতা', 'জীবন ও স্বাধীনতার অধিকার' সহ বিভিন্ন ধরনের নাগরিক অধিকারের কথা লিপিবদ্ধ রয়েছে। এমনকি ১৯(১)(ছ) ধারায় প্রত্যেক নাগরিকের জীবিকা ও পেশা নির্বাচনের অধিকার রয়েছে। এতদ্‌সত্ত্বেও, কর্মস্থলে বৈষম্যমূলক আচরণ ও যৌন হেনস্থার শিকার হন মহিলা কর্মচারীরা। এক কথায় যা নাগরিক সমাজের অংশ হিসেবে প্রাপ্য সংবিধান প্রদত্ত মৌলিক অধিকারের ওপর আক্রমণ।

কর্মস্থলে পদোন্নতি সহ বিভিন্ন ন্যায্য প্রাপ্তি প্রদানে সাহায্যকারীর ভূমিকা পালনে সক্ষম এমন দাবি করে, তার বিনিময়ে অধস্তন মহিলা সহকর্মীর সাথে যৌন ইঙ্গিতপূর্ণ আচরণের ঘটনাও সরকারী দপ্তর ও প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে বিরল নয়। উপযুক্ত সুরক্ষিত পরিবেশের অভাবজনিত নিরাপত্তাহীনতার বোধ থেকে মুখ বুজে অন্যায় ও অশ্লীল আচরণকে মেনে নেওয়ার অসহায় মানসিকতা যেমন বহু ক্ষেত্রে প্রতিবাদ করার মনোবল কেড়ে নেয়, তেমনই অস্ফুটে বা সোচ্চারে প্রতিবাদ করলে বর্ধিত প্রতিহিংসামূলক আচরণের নিদর্শনও বিভিন্ন সময়ে শোনা যায় বা দেখা যায়। কখনও কখনও দপ্তর বা প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে দুর্নীতি সহ বিভিন্নরকম অন্যায় ও অবিচারের প্রতিবাদের ফলস্বরূপ মহিলা কর্মচারীরা মানসিক ও শারীরিক নিগ্রহের শিকার হন।

বহু ক্ষেত্রেই মানসিক অবসাদের শিকার হয়েও মহিলা কর্মচারীরা অপরাধমূলক পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা ও ব্যাভিচারী প্রবৃত্তির সাথে সহাবস্থান করতে অথবা কিছুটা দূরত্ব বজায় রেখে মানিয়ে চলতে বাধ্য হন। জ্ঞাত অথবা অজ্ঞাতসারে এমন লিঙ্গ-দ্বেষের ঘটনা বিভিন্ন সময় ঘটলেও সরকারী প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে সীমাহীন কদর্যতা ও নির্মমতার বিরলতম ঘটনার সাক্ষী হয়ে রইল এই রাজ্যের একটি প্রতিষ্ঠিত সরকারী মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল। এই ঘটনা শুধুমাত্র বিশ্বের দরবারে নবজাগরণ ও প্রগতিশীলতার পীঠস্থান বাংলার মাথা হেঁট করে দিয়েছে তাই নয়, সমস্ত সরকারী দপ্তর ও প্রতিষ্ঠানে কর্মরত মহিলা কর্মচারীদের আরও বেশি ভীত-সন্ত্রস্ত করে তুলেছে। কর্মস্থলে (সরকারী ও বেসরকারী) যৌন নিগ্রহ, হয়রানি অথবা ইঙ্গিতপূর্ণ আচরণের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার পৃথক কোনো আইন নেই। সাধারণ ফৌজদারী আইনে বিচার প্রক্রিয়া চলে। কিন্তু এই ধরনের যত ঘটনা ঘটে, তার সবগুলিই বিভিন্ন কারণে পুলিশ প্রশাসন অথবা আদালত পর্যন্ত গড়ায় না। যা পরোক্ষে অপরাধীদের সাহস বৃদ্ধি করে।

কোনো নির্দিষ্ট আইনের অনুপস্থিতিজনিত শূন্যতাকে পূরণ করার জন্যই সর্বোচ্চ আদালতের প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের বেঞ্চ ১৯৯৭ সালে (১৩.৮.১৯৯৭) একটি রায়ের মাধ্যমে প্রতিটি কর্মস্থলে (সরকারী ও বেসরকারী) লিঙ্গ বৈষম্য দূরীকরণ ও যৌন হয়রানি রোধ করার জন্য কমিটি গঠনের নির্দেশ দেয়। উল্লিখিত মামলার শিরোনাম অনুযায়ী সুপ্রীম কোর্ট প্রস্তাবিত এই কমিটি বিশাখা কমিটি নামেই পরিচিত।

সর্বোচ্চ আদালত ঐ রায়ে একথাও বলে যে, যতদিন পর্যন্ত না আইনসভা কোনো নির্দিষ্ট আইন প্রণয়ন করবে, ততদিন সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশিকা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আইন হিসেবে বিবেচিত হবে।

এই প্রসঙ্গে আমাদের সুনির্দিষ্ট অভিযোগ হল, মহিলা কর্মচারীদের আধিক্য রয়েছে এমন সমস্ত সরকারী দপ্তর, বিভাগ বা প্রতিষ্ঠানে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশিকাকে মান্যতা দিয়ে 'বিশাখা কমিটি' গঠন করা হয়নি, অথবা খাতায় কলমে গঠন করা হলেও নিষ্ক্রিয় হয়ে রয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এই ধরনের কমিটি চালু থাকলেও, নির্দিষ্ট সময় অন্তর সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সর্বোচ্চ আধিকারিকের কাছে প্রাপ্ত অভিযোগের নিষ্পত্তি সংক্রান্ত রিপোর্ট প্রদান করা হয় না। এমনকি কমিটি গঠনের ক্ষেত্রেও কোথাও কোথাও সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশিকা মেনে নির্দিষ্ট সংখ্যায় মহিলা সদস্য মনোনয়ন করা হয় না।

কর্মস্থলে মহিলা কর্মচারীদের নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা ও লিঙ্গ বিদ্বেষ নিবারণের জন্য সুপ্রিম কোর্টের তাৎপর্যপূর্ণ নির্দেশিকার ওপর প্রয়োজনীয় গুরুত্ব আরোপ না করার অর্থই হল সরকার এই বিষয়ে যথেষ্ট আন্তরিক নয়। এই বিষয়ে রাজ্য সরকারের গয়ংগচ্ছ মনোভাবেরই ফল ভুগতে হল আর জি কর হাসপাতালের পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ট্রেনি তরুণী চিকিৎসককে। স্বভাবতই স্বাস্থ্যক্ষেত্র সহ প্রশাসনের অভ্যন্তরে কর্মরত মহিলা কর্মচারীরা আশঙ্কিত ও ক্ষুব্ধ।

এমতাবস্থায়, বিশাখা মামলার রায়ে সুপ্রিম কোর্ট প্রদত্ত ১২ দফা নির্দেশিকা অনুযায়ী প্রতিটি কর্মস্থলে (যেখানে মহিলা কর্মচারীরা কর্মরত) 'বিশাখা কমিটি' গঠন অথবা ইতিমধ্যে গঠিত কমিটিগুলিকে সঠিকভাবে পরিচালনার কাজটি অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বিবেচনা করা প্রয়োজন বলে আমরা দাবি করছি।

আমরা আশা করি রাজ্য প্রশাসনের সর্বোচ্চ আধিকারিক হিসেবে আপনি এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করে, সর্বস্তরের মহিলা কর্মচারীদের আশ্বস্ত করবেন।

যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের প্রত্যাশা রেখে,

ধন্যবাদ সহ—

তাং ঃ ৩০/১০/২০২৪

ভবদীয়
বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী
(বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী)
সাধারণ সম্পাদক

সি আই টি ইউ'র সর্বভারতীয় কাউন্সিল উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা

সি আই টি ইউ'র সর্বভারতীয় কাউন্সিল সভাকে কেন্দ্র করে ১২ই জুলাই কমিটির ব্যবস্থাপনায় গত ২ আগস্ট, ২০২৪ বিধাননগরের কে এম ডি এ প্রেক্ষাগৃহে (মহানায়ক মঞ্চ) একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। আলোচ্য বিষয় ছিল ''মধ্যবিত্ত সমাজে নয়া উদারবাদের প্রভাব''। এই সভায় প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক সাত্যকি রায়। সভায় সভাপতিত্ব করেন সি আই টি ইউ নেতা সুরজিত বসু। অধ্যাপক সাত্যকি রায় তাঁর বক্তব্যে বলেন, স্বাধীনোত্তর ভারতে মধ্যবিত্ত সমাজ গড়ে ওঠে। এই সমাজকে শুধুমাত্র উপার্জনের ভিত্তিতে নির্ণয় করা যায় না। সাংস্কৃতিক ও অন্যান্য অনেক বিষয়ে এই সমাজের অবদান অনেক। মূলত শিক্ষিত, সংস্কৃতিবান একটা শ্রেণি থেকে মধ্যবিত্তের উৎপত্তি। রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প ও সরকারি সেক্টরের পক্ষে মধ্যবিত্ত শ্রেণি বরাবরই কথা বলে এসেছে। আগে অফিসকাছারিতে একটা নির্দিষ্ট সময়সীমা মেনে কাজ করা হত। দেশের ১০ থেকে ১৫ শতাংশ মানুষ রাষ্ট্রায়ত্ত ও সরকারি ক্ষেত্রে চাকরি করত। তার মধ্যে স্কুলের মাস্টার মশাই এবং কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরাও ছিলেন। যে চিত্রটা আমাদের আগের এবং আমাদের প্রজন্মে ছিল, সেটা আর নেই। এখন Standard Employment Structure-টাই পালটে গেছে। এই প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের মাইনে অনেক বেশি, কিন্তু তাদের কাজের কোনো নির্দিষ্ট সময়সীমা নেই। অনেক বেশি সময় ধরে তাদের কাজ করতে হয়। কাজের ক্ষেত্রে একটা অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে, যার সুযোগ কর্পোরেট ও বহুজাতিক সংস্থাগুলো নিচ্ছে। চাকরি বাদ দিয়ে ব্যক্তিগত জীবন বলে বর্তমান ছেলেমেয়েদের কিছু নেই। মধ্যবিত্ত শ্রেণির ছেলেমেয়েরা সেই অধিকার হারিয়েছে। আজ অধিকাংশ মধ্যবিত্ত শ্রেণির ছেলেমেয়েরা রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্র ও সরকারী অফিসে কাজ করে না। সেই কাজের সুযোগ ক্রমশ সংকুচিত হচ্ছে। এটাই নয়া উদারবাদের প্রভাব। আগে মধ্যবিত্ত শ্রেণির চাকরিজীবীরা বিকেলে অফিস ছুটির পর গানবাজনা, নাটক ও অন্যান্য সৃষ্টিশীল কাজকর্মের সাথে যুক্ত থাকতেন। এখন সেই সুযোগ আর নেই। মধ্যবিত্ত শ্রেণির ওপর নয়া উদারবাদের আক্রমণ সমাজে সেই শ্রেণির অবদানকে আস্বাভাবিক পরিমাণে কমিয়ে দিয়েছে। আগে সরকারি ও রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে চাকরিটা আদর্শ ছিল। সেই চাকরিতে মধ্যবিত্ত শ্রেণির সমস্ত অধিকার সুরক্ষিত থাকত। এখন সেই চাকরির সুযোগ খুবই সীমিত। কর্পোরেট ও বহুজাতিক সংস্থার চাকরিতে গিয়ে ছেলেমেয়েরা সমস্ত অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। আট ঘণ্টা কাজের অধিকার মানুষ হারিয়েছে। বেঁচে থাকার জন্য তাকে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত পরিশ্রম করতে হচ্ছে। তাকে বোঝানো হচ্ছে যে তাকে অনেক বেশি বেতন ও অন্যান্য সুযোগসুবিধা দেওয়া হচ্ছে এবং সেই কারণে সে যেন কৃতজ্ঞ থাকে। দুটো শ্রেণি তৈরি হয়ে গেছে। তার একটা হল priviledged class. ভবিষ্যতে মধ্যবিত্ত সমাজের ওপর আরো বড়ো আক্রমণ আসতে চলেছে। Automation, AI, Robotics, এই সমস্ত প্রয়োগের ফলে কাজের সুযোগ সাংঘাতিকভাবে কমে যাবে। Repetitive ধরনের কাজগুলো AI প্রয়োগ করে করা হবে, মানুষের আর প্রয়োজন হবে না। এর ফলে আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশে তো বটেই, উন্নত দেশগুলোতেও বহু মানুষ কাজ হারাবে। উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে কাজের সময় কমে যাওয়ার কথা। কিন্তু বাস্তবে তা হচ্ছে না। তাই উন্নত দেশগুলোতে ট্রেড ইউনিয়নগুলোর এখন প্রধান দাবি হল কাজের সময় কমিয়ে আনা। আমাদের দেশে মধ্যবিত্ত শ্রেণি, অর্থাৎ মাঝের চল্লিশ শতাংশ মানুষের গড় আয় কমে আসছে। ১৯৫০ সালে আমাদের জাতীয় আয়ের ৪৩ শতাংশ মধ্যবিত্ত শ্রেণির থেকে আসত। এখন আসে মাত্র ২৭ শতাংশ। মধ্যবিত্ত শ্রেণির একাংশ আবার মনে করত যে নয়া উদারনীতির প্রয়োগের ফলে তারা উপকৃত হবে। কিন্তু বাস্তবে তা খুব কম ক্ষেত্রেই হয়। প্রতিটি ক্ষেত্রের মানুষ আজ আক্রান্ত। আজ সব ক্ষেত্রেই নিয়োগকর্তার অধিকার অনেক বেশি। নয়া উদারবাদের প্রয়োগের ফলে চাকরির শর্তগুলো বদলাতে বদলাতে ক্রমশ নিয়োগকর্তার পক্ষে চলে যাচ্ছে। তাই নয়া উদারবাদের বিরুদ্ধে লড়াইকে সংগঠিত করতে গেলে আমাদের প্রত্যেককে কিছু কিছু আত্মত্যাগ করতে হবে। নইলে শ্রমজীবী মানুষের বৃহত্তর ঐক্যকে গড়ে তোলা যাবে না। প্রধান বক্তার আলোচনা শেষে তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি আলোচনা সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন। □

ইন্দ্রজিৎ রায় চৌধুরী

Editor : MANAS KUMAR BARUA
SANGRAMI HATIAR
State Co-ordination Committee
52nd Year, 3rd & 4th Edition, July-August, 2024
Regd. No. : 18484/71

দক্ষিণপন্থার জয়ে পুনরায় ট্রাম্প রাষ্ট্রপতি

দ্বিতীয়বার ডোনাল্ড জন ট্রাম্প পৃথিবীর সর্বাধিক ধনী এবং ক্ষমতাশীল দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হলেন। দেশের ৪৭তম প্রেসিডেন্ট হচ্ছেন ট্রাম্প। তিনি পরাজিত করেন তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ডেমোক্র্যাট দলের প্রার্থী কমলা হ্যারিসকে। আমেরিকার ইতিহাসে তিনিই দ্বিতীয় প্রেসিডেন্ট, যিনি একবার প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত হয়ে পরের বার নির্বাচনে হেরে গিয়ে আবার তারপরের বার পুনরায় নির্বাচিত হলেন। ১৩২ বছর আগে আমেরিকার ২২ ও ২৪তম প্রেসিডেন্ট পদে একইভাবে নির্বাচিত হয়েছিলেন গ্রোভার ক্লিভল্যান্ড।

গত ৫ নভেম্বর, ২০২৪ রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন রিপাবলিকান পার্টির ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং ডেমোক্র্যাটিক পার্টির কমলা হ্যারিস। বামপন্থী প্রার্থী জিল স্টাইন এবং আইনজীবী রবার্ট কেনেডি। জনরায়ে ডোনাল্ড ট্রাম্প পান ৫৩৮টি ইলেকট্রোরাল ভোটের মধ্যে ৩১২টি (৭ কোটি ৬৮ লক্ষ ৩০ হাজার ৬৯টি ভোট) প্রায় ৫১ শতাংশ ভোট। বর্তমান ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস পান ২২৬টি (৭ কোটি ৪৩ লক্ষ ১৮ হাজার ১০৫টি ভোট), প্রায় ৪৮ শতাংশ। বামপন্থী প্রার্থী জিল স্টাইন পান ৭ লক্ষ ৭৪ হাজার ১৯৩ টি ভোট (০.৫% ভোটের সমর্থন) এবং রবার্ট কেনেডি পান ৭ লক্ষ ৫০ হাজার ৮৯৮টি ভোট (প্রায় ০.৫% ভোটারের সমর্থন)। ৫৩৮টি ইলেকট্রোরাল ভোটের মধ্যে ২৭০টির ম্যাজিক ফিগার ইলেকট্রোরাল ভোট পেয়ে আগামী ২০ জানুয়ারি, ২০২৫ রাষ্ট্রপতি পদে শপথ নেবেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। উপরাষ্ট্রপতি পদে শপথ নেবেন জেমস ডেভিড ভান্স। জয়ের পর ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেন, ''আমরা ইতিহাস গড়লাম, আমার সমস্ত শক্তি, আত্মা আর শরীরের আগুন দিয়ে আমেরিকাকে সর্বোত্তম করে তুলব।'' প্রচারে বার বার তুলে ধরেছেন, ''আমেরিকা ফাস্ট, মেক আমেরিকা গ্রেট এগেন।'' চার মাস আগে এক প্রচার র‍্যালিতে আততায়ীর গুলি ট্রাম্পের কান ছুয়ে বেরিয়ে যাওয়ার পর কিছুক্ষণের জন্য বসে পড়েছিলেন। পরে উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, 'আমাকে এভাবে হারানো যাবে না'। এই ঘটনার প্রভাব ভোটারদের মধ্যে পড়েছিল। সবক'টি সুইং স্টেট (পেনসিলভেনিয়া, নর্থ ক্যারোলাইনা, জর্জিয়া, মিশিগান, অ্যারিজোনা, উইসকনসিন, নেভাডা) ট্রাম্পের দখলে গিয়েছে। নিজের জয় নিশ্চিত হওয়ার পাশাপাশি রিপাবলিকানদের সেনেট দখলে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন ট্রাম্প এবং হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভসেও দখল বজায় থাকবে বলে জানান। এই প্রথম কোনও রিপাবলিকান প্রার্থী শুধু ইলেকটোরাল ভোট নয়, পপুলার ভোটেও জিতলেন।

আমেরিকার প্রেসিডেন্টদের মধ্যে একমাত্র ট্রাম্পই ফৌজদারি মামলায় দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন। পর্ণ তারকা স্টর্মি ড্যানিয়েলের মুখ বন্ধ রাখার জন্য ১ লক্ষ ৩০ হাজার ডলার ঘুষের টাকা ভুয়ো ব্যবসায়িক তহবিল হিসেবে দেখিয়েছিলেন। দুইবার তাঁকে দেশের সংসদে ইমপিচ করার চেষ্টা করা হয়েছে। একজন ভদ্রমহিলাকে যৌন হেনস্থা এবং সম্মানহানি করার মামলায় কোর্ট ট্রাম্পকে ৮ কোটি ডলারের বেশি ক্ষতিপূরণ দেওয়ার রায় ঘোষণা করে। তিনি ২০২০ রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে পরাজিত হয়েও উস্কানিমূলক বক্তৃতা দিয়ে ক্যাপিটলে হামলা চালিয়েছিলেন তার সমর্থকদের নিয়ে ঐ হামলায় নিহত হয়েছিলেন ছ'জন, জখম হয়েছিলেন ১৭৪ জন পুলিশ অফিসার। দীর্ঘদিন ধরে ট্রাম্প আয়কর ফাঁকি দিচ্ছেন। এমনই একজন ব্যক্তি আগামী চার বছরের জন্য আমেরিকার রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়েছেন।

ট্রাম্পের মতো ব্যক্তির বিপুল জনসমর্থনের মাধ্যমে নির্বাচিত হওয়ার পিছনে কী কারণ রয়েছে?

দেশে খাদ্যপণ্যের বিপুল মূল্যবৃদ্ধি, বেকারির সঙ্কট, বাড়ি ভাড়ায় অস্বাভাবিক বৃদ্ধি, গড় আয়ে মারাত্মক হ্রাস, মন্দার বিপরীতে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ না করা ইত্যাদি সমস্যাগুলি বাইডেন প্রশাসন সমাধান করতে না পারায় সরকার বিরোধী ভোটে জিতেছে ট্রাম্প। পাশাপাশি ট্রাম্পের বিদ্বেষ ছড়ানো ভাষণ, বেকারী ও অর্থনৈতিক সঙ্কটের জন্য সরাসরি অভিবাসীদের দায়ী করে তাদের দেশছাড়া করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া, 'পুরনো গৌরব' ফিরিয়ে আনার মতো প্রতিশ্রুতি সাধারণ ভোটারদের বড় অংশকে আকর্ষণ করেছে।

আমেরিকার বিধ্বংসী বিদেশনীতি নিয়ে হতাশ দেশের তরুণ সমাজকে আকৃষ্ট করতে ইউক্রেন ও গাজায় যুদ্ধ কমাবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন প্রচারে। জিনিসপত্রের দাম কমাতে খুচরো ব্যবসায়ীদের উপর শুল্ক বাড়ানো হবে, শিল্পে কর কমিয়ে কর্মসংস্থান বাড়ানো হবে, গর্ভপাত রোধে আইন প্রণয়ন করা হবে এমনই বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি 'প্রোজেক্ট ২০২৫'-এ দিয়েছেন ট্রাম্প।

এবারের আমেরিকার রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে পৃথিবীর ১৫০ জন ধনী ব্যবসায়ী / সংস্থা ১৯০ কোটি ডলার খরচ করেছেন। এর বেশিরভাগ অর্থ ট্রাম্প পেয়েছেন। এই ধনীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন ইলন মাস্ক, টিমোথি মেলন, মিরিয়াম আন্ডারসন এবং বিভিন্ন সংস্থা যেমন লকহিড মার্টিন, বোয়িং, নরথ্রপ গ্রুমান, জেনারেল মটরস ও ডেল্টা এয়ার লাইন্সের মতো যুদ্ধাস্ত্র তৈরি করে এমন বেশ কয়েকটি বড় সংস্থা ট্রাম্পের প্রচারে আর্থিকভাবে সাহায্য করেছে।

অপরদিকে কমলা হ্যারিসের ডেমোক্রাটিক পার্টি বহু দশক ধরেই কর্পোরেট স্বার্থে বা তাদের চাহিদা মতো চলছে। দেশে যখন চাকরি কমছে, আকাশছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধি হচ্ছে, যুদ্ধ অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে গিয়ে বিভিন্ন দেশে যুদ্ধ জিইয়ে রাখছে। ফলে তার প্রভাব পড়ছে বিশ্বজুড়ে। এই সমস্যাগুলির বিকল্প কর্মসূচী বা পদক্ষেপ গ্রহণে ব্যর্থ হয়েছে বাইডেন সরকার। বার্নি স্যান্ডার্সের মতে গুটিকয়েক নেতা আর্থিক বৈষম্য, বিলিয়নিয়রদের বাড়বাড়ন্ত নিয়ে সোচ্চার হলেও তাদের কথা উপেক্ষা করা হয়েছে, তাই আমেরিকানদের মধ্যে ডেমোক্রেটিক পার্টির সমর্থন কমেছে। এরই সুযোগ নিয়েছেন ট্রাম্প।

আবিশ্বে কয়েক দশক ধরে যে দক্ষিণপন্থা দাপিয়ে বেড়াচ্ছে সেখানে ট্রাম্পের মতো রাজনীতিবিদরা ভয়-ভীতি-ঘৃণার ভিত্তিতে ক্ষমতা কায়েম করছে। যেমন মার্কিনীদের ভয় দেখানো হয়েছে, তোমার চাকরি বেআইনি অনুপ্রবেশকারীরা, কৃষ্ণাঙ্গরা খেয়ে নিচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে ঘৃণা তৈরি কর। আমেরিকায় মহিলাদের অধিকার খর্ব হয়েছে। গর্ভপাতের অধিকার থেকে তাঁরা বঞ্চিত হয়েছেন। যদিও ট্রাম্প গর্ভপাত আইনের পরিবর্তন করবেন বলে প্রচারে জানিয়েছেন। সমকামী তথা প্রান্তিক যৌনতার মানুষদের বিরুদ্ধে ট্রাম্প ধারাবাহিক কুৎসা করেছেন। এই পরিস্থিতিতে ট্রাম্পের পুনরায় রাষ্ট্রপতি হওয়া দক্ষিণপন্থার জয়।

ট্রাম্পের এই জয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে অনেক অশ্বেতাঙ্গ। অনেকেই আশঙ্কায় আছেন যে ট্রাম্পপন্থীরা চরমপন্থী মতাদর্শ ও শ্বেতাঙ্গ আধিপত্যবাদে বিশ্বাসী, তাদের কার্যকলাপ হিংসাত্মক চেহারা নিতে পারে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ট্রাম্পের ঐতিহাসিক জয়ে অভিনন্দন জানিয়েছেন। চিন বিরোধী 'কোয়াড' আরও চাঙ্গা হবে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। আগামী বছর কোয়াডের শীর্ষ সম্মেলনে ট্রাম্পের ভারত সফরে আসার কথা। কিন্তু রাশিয়া থেকে ভারতের তেল আমদানি করা এবং ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধে রাশিয়াকে সাহায্য করা, বাংলাদেশের ভোটে অনিয়ম সত্ত্বেও ভারতের নিশ্চুপ থাকা, পাকিস্তান নীতি, পূর্ব এশিয়ার সংঘাত, এইচ ১বি ভিসার অনুমোদন, আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য শুল্ক প্রসঙ্গে আগামী দিনে ট্রাম্প প্রশাসনের অবস্থানও চিন্তায় রাখবে ভারতকে। অন্যদিকে এই নির্বাচনে যারা পুঁজি ঢেলেছেন তাঁদের মুনাফার স্বার্থে জনহিতকারী কাজগুলি ধ্বংস করা হবে। যুক্তির উপরে অপযুক্তি প্রতিষ্ঠা করা হবে, জলবায়ু চুক্তি, ইরানের সঙ্গে পরমানু চুক্তি থেকে সরে আসবে ট্রাম্প। অর্থাৎ আগামীদিনে ভূবিশ্বে অশান্তি ও যুদ্ধ উন্মাদনা আরো বাড়বে। উগ্র দক্ষিণপন্থা আরো প্রতিষ্ঠিত হবে। বিশ্বের প্রগতিশীল, শান্তিকামী মানুষের ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ের মাধ্যমে একে প্রতিরোধ করতে হবে। □

বিদ্যুত দাস

মৃত কর্মচারীর পোষ্যের চাকরি সংক্রান্ত জটিলতা কাটানোর দাবিতে রাজ্যের মুখ্যসচিবকে চিঠি

মাননীয় মুখ্যসচিব
পশ্চিমবঙ্গ সরকার,
৩২৫ শরৎ চ্যাটার্জী রোড, নবান্ন, হাওড়া

বিষয় ঃ কর্মরত অবস্থায় মৃত কর্মচারীর পরিবারের পোষ্যের চাকরি সংক্রান্ত (অনুকম্পাজনিত) বিষয় সম্পর্কে

মহাশয়,

আপনি নিশ্চিত অবহিত আছেন যে রাজ্য সরকার অনুকম্পাজনিত (কর্মরত অবস্থায় মৃত কর্মচারীর পরিবারের পোষ্যের) চাকরির জন্য একটি সুসংহত স্কিম চালু করেছে যা ওয়েস্ট বেঙ্গল স্কিম ফর কম্প্যাশনেট এ্যাপয়েন্টমেন্ট, ২০১৩ (West Bengal Scheme for Compassipu Appointment, 2013) হিসেবে পরিচিত। ঐ স্কিমের যথাযথ রূপায়ণের জন্য পদ্ধতি, আবেদনকারী কে হতে পারেন তার যোগ্যতা, ছাড় (exemption), নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কে হবেন, কোন পদের জন্য ঐ পোষ্য বিবেচিত হবেন তার ধারাগুলি বিস্তারিত ব্যাখ্যাত হয়েছে (নোটিফিকেশন নং-২৫১-ই এম পি তারিখ-০৩.১২.২০১৩, শ্রম বিভাগ)। এ বিষয়ে দফায় দফায় আরও কিছু নির্দেশাবলী পরবর্তীতে প্রকাশ করে স্কিমের রূপায়ণ সুনির্দিষ্টভাবে সুনিশ্চিত করতে চাওয়া হয়েছে।

কিন্তু সাম্প্রতিককালে এই স্কিমের রূপায়ণে রাজ্য সরকারের বেশ কিছু বিভাগের গাফিলতি এবং বিচ্যুতির (departure) ঘটনা ঘটছে। তার কয়েকটি বিষয় আপনার নজরে আনতে চাই।

প্রথমতঃ স্কিমের ৪নং ধারায় কোন পদে নিয়োগ করা যেতে পারে তার ব্যাখ্যা হিসেবে গ্রুপ সি ও গ্রুপ ডি পদের কথা সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা সত্ত্বেও বেশ কিছু বিভাগে উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীদের নির্বিচারে কেবলমাত্র গ্রুপ ডি পদেই নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ নিয়োগপত্র দিচ্ছেন। এটি রাজ্য সরকারের ঘোষিত নীতির সম্পূর্ণ পরিপন্থী। এতে পর্যাপ্ত পরিমাণ শূন্যপদ থেকে যাওয়ায় প্রশাসনিক কাজও যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

দ্বিতীয়তঃ প্রচুর পরিমাণে শূন্যপদ থাকা সত্ত্বেও বেশ কিছু বিভাগ বহু বছর ধরে বিবেচ্য কেসগুলি ফেলে রেখে চূড়ান্ত অমানবিকতার পরিচয় দিচ্ছে, তেমনি সরকারী পরিষেবা প্রদানও প্রভূতভাবে বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে।

তৃতীয়তঃ এই স্কিমের একটি ব্যাখ্যায় (নোটিফিকেশন নং-২৬-ই এম পি তারিখ ০১.০৩.২০১৬ শ্রম বিভাগ) সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের করণীয় বিশদে সুস্পষ্টভাবে বিধৃত হলেও (১০(বি) (বি) নতুন ধারা যুক্ত হয়েছে, নোটিফিকেশন নং-২৫১-ই এম পি তারিখ ০৩.১২.২০১৩-র সাথে অনেক কর্তৃপক্ষ সময়ে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় এই ধরনের কেসগুলি নির্দিষ্ট সময়ে নিষ্পত্তি হচ্ছে না, যার ফলে হতভাগ্য পরিবারগুলি নিদারণ আর্থিক সঙ্কটে বিপন্ন হয়ে পড়ছেন। আমরা আশা করি, রাজ্য প্রশাসনের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ হিসেবে আপনি এই স্কিমটির যথাযথ রূপায়ণে উদ্ভূত এই প্রতিবন্ধকতাগুলি অপসারণে দ্রুত যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন এবং মৃত কর্মচারীর অসহায় পরিবারগুলিকে এই সঙ্কটপূর্ণ সময়ে পরিত্রাণের ব্যবস্থা করবেন।

ধন্যবাদান্তে,

ভবদীয়
বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী
(বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী)
সাধারণ সম্পাদক

সলিল চৌধুরী ও মৃণাল সেনের জন্ম শতবার্ষিকীতে কেন্দ্রীয় কর্মসূচী প্রতিপালন

১৩ নভেম্বর, ২৯২৪ বুধবার কর্মচারী ভবনের অরবিন্দ সভাকক্ষে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে প্রখ্যাত গীতিকার ও সুরকার সলিল চৌধুরী এবং প্রখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক মৃণাল সেনের জন্মশতবর্ষে শ্রদ্ধার্ঘ্য জানিয়ে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। বিষয় ছিল ''নভেম্বর বিপ্লবের বার্তার আলোকে সলিল চৌধুরী ও মৃণাল সেন''। আলোচনা সভার মূল আলোচক ছিলেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির প্রাক্তন সহ সম্পাদক তথা কর্মচারী আন্দোলনের অন্যতম প্রবীণ নেতৃত্ব প্রবীর মুখার্জি। আলোচনা সভার শুরুতে প্রারম্ভিক বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী বলেন যে ১০৮তম বর্ষে পৌছেও আজ নভেম্বর বিপ্লবের প্রাসঙ্গিকতা একইরকম রয়েছে। তিন দশক আগে সোভিয়েত সাধারণতন্ত্রের পতনের পর অনেকে ভেবেছিলেন যে সমাজতন্ত্রের ধারনা বোধহয় প্রাসঙ্গিকতা হারিয়েছে। কিন্তু অচিরেই সেই ভুল ধারনা ভেঙে যায়। আজ পুঁজিবাদ যখন সংকটের সম্মুখীন তখন তার থেকে পরিত্রাণ পাবার পথ খুঁজতে দাস ক্যাপিটালের শরণাপন্ন হচ্ছে বিশ্ব। দুনিয়াজুড়ে যেভাবে উগ্র দক্ষিণপন্থী আক্রমণের মাত্রা বাড়ছে, তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও নভেম্বর বিপ্লবের ভূমিকা এবং প্রাসঙ্গিকতা অনস্বীকার্য। মানুষের চেতনার উন্মেষের ক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। আজ যখন আমাদের রাজ্য বা দেশ তো বটেই, দুনিয়াজুড়েই সাংস্কৃতিক অবক্ষয় নেমে এসেছে, তার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ক্ষেত্রে সলিল চৌধুরী এবং মৃণাল সেনের জন্মশতবর্ষ পালন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। সভার মূল আলোচক প্রবীর মুখার্জি তাঁর বক্তব্যে বলেন যে ১০৭ বছর আগে কমরেড লেনিনের নেতৃত্বে নভেম্বর বিপ্লব ঘটে যাওয়ার পর তার প্রভাব সারা বিশ্বজুড়েই পরিলক্ষিত হয়। পরাধীন দেশগুলি স্বাধীনতার আন্দোলন বুদ্ধি করার অনুপ্রেরণা পায়। বিভিন্ন দেশে শ্রমিকশ্রেণির পার্টি, ওয়ার্কার্স পার্টি, কমিউনিস্ট পার্টিগুলি আরও শক্তিশালী হতে শুরু করে। পৃথিবীর প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গড়ে তোলার সংগ্রাম, প্রথম সর্বহারার একনায়কতন্ত্র গড়ে তোলার সংগ্রাম দেখিয়েছিল নভেম্বর বিপ্লব। ১৯৮৯ সালে সোভিয়েত সাধারণতন্ত্রের পতন ঘটায় সমাজতান্ত্রিক শিবির দুর্বল হয়ে পড়লেও পুঁজিবাদ মানুষকে কোনও উত্তরনের পথ দেখাতে পারেনি। বরং পুঁজিবাদ ২০০৮ থেকে যে মহাসংকটের সম্মুখীন হয়েছে, নিজেই তার থেকে উত্তরণের পথ খুঁজে পায়নি। আমাদের দেশে যেখানে বুর্জোয়া ব্যবস্থার সাথে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থারও অবশেষ রয়ে গেছে, যেখানে উগ্র দক্ষিণপন্থা হিন্দুত্ববাদকে অস্ত্র করে শ্রমজীবী মানুষের ওপর আক্রমন নামিয়ে আনছে, এর বিরুদ্ধে লড়াইয়েও নভেম্বর বিপ্লবের শিক্ষা যথেষ্টই প্রাসঙ্গিক। সলিল চৌধুরী এবং মৃণাল সেন সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে প্রবীর মুখার্জি বলেন যে তাঁরা দুজনেই ছিলেন সমসাময়িক এবং যৌবনের দিনগুলি থেকেই তাঁদের মধ্যে ছিল প্রগাঢ় বন্ধুত্ব, যা সলিল চৌধুরীর মৃত্যু অবধি অটুট ছিল। সলিল চৌধুরীর মৃত্যুশয্যায় যাঁরা পাশে ছিলেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম মৃণাল সেন। সলিল চৌধুরীর ছোটবেলা কেটেছিল আসামে। ছাত্র অবস্থা থেকেই তিনি বামপন্থী ছাত্র সংগঠনের সাথে যুক্ত হন। যুক্ত হন সাংস্কৃতিক সংগঠন আই পি টি এ'র সাথে। ঘনিষ্ঠ হন হেমাঙ্গ বিশ্বাসের সাথে। পরবর্তীকালে তিনি কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হন, যুক্ত হন জমির আন্দোলনের সাথে, যুক্ত হন তেভাগা আন্দোলনে। পরবর্তীকালে নেতৃত্বের নির্দেশে তিনি গণ আন্দোলনের কর্মী থেকে সাংস্কৃতিক আন্দোনের কর্মীতে রূপান্তরিত হন, যুক্ত হন গণ সঙ্গীত আন্দোলনের সাথে। বিভিন্ন গণ আন্দোলনে তাঁর লেখা এবং সুরারোপিত গান বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল। আজও আমাদের লড়াই, আন্দোলনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ এই সকল গান। মৃণাল সেন জন্মেছিলেন বাংলাদেশের ফরিদপুরে ১৯২৩ সালে। পারিবারিকভাবে তৎকালীন স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল তাঁর। পরবর্তীকালে কলকাতায় পড়াশোনা করতে এসে ছাত্র আন্দোলনের সাথে যুক্ত হন, যুক্ত হন বামপন্থী আন্দোলনের সাথে। ফিল্ম সোসাইটির সাথে যুক্ত হবার কারণে সিনেমার প্রতি আগ্রহ বাড়তে থাকে। যুক্ত হন চলচ্চিত্র পরিচালনার সাথে। সেসময় দেশজুড়ে যে অন্য ধারার চলচ্চিত্রের যে প্রসার ঘটছিল, মৃণাল সেনের হাত ধরে তা আরও বিকশিত হয়। 'কলকাতা ৭১', 'পদাতিক', 'মৃগয়া', 'খন্ডহর', 'একদিন প্রতিদিন', 'ভুবন সোম', 'আকালের সন্ধানে', 'খারিজ', 'ইন্টারভিউ' প্রভৃতি ছবিগুলি বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। আজীবন বামপন্থার প্রতি আস্থাশীল ছিলেন মৃণাল সেন। বিভিন্ন সময়ে দেশে-বিদেশে ঘটে চলা বিভিন্ন ঘটনার প্রতিক্রিয়ায়, বিভিন্ন ঘটনার প্রতিবাদে তিনি যেমন পথে নেমেছেন একইভাবে কলম হাতেও গর্জে উঠেছেন। তিনি রাজ্যসভার সাংসদের ভূমিকাও সাফল্যের সঙ্গে পালন করেছেন। বর্তমান সময়ে যে অস্থির সময়ের মধ্যে আমরা আছি, যে দ্রোহকালের মধ্যে আমরা আছি, যে জনজাগরণ, যে গণ আন্দোলনের মধ্যে আজ আমরা রয়েছি সেই লড়াইয়ে সফল হতে গেলে চেতনায় শাণ দিয়ে আমাদের এগোতে হবে, এই চেতনায় শাণ দেবার কাজে আমাদের এগিয়ে নিয়ে যাবে সলিল চৌধুরী এবং মৃণাল সেনের মতো মানুষদের নিয়ে চর্চা। এই আলোচনাসভায় সভাপতিত্ব করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সভাপতি মানস দাস। □

দীপঙ্কর বাগচী

আলোচনা করছেন প্রবীর মুখার্জী

সম্পাদক ঃ মানস কুমার বড়ুয়া
সহযোগী সম্পাদক ঃ সুমন কান্তি নাগ
যোগাযোগ ঃ
ই-মেল ঃ sangramihatiar@gmail.com
ওয়েবসাইট ঃ www.statecoord.org
রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষে অজয় মুখোপাধ্যায় কর্তৃক ১০-এ শাঁখারীটোলা স্ট্রীট, কলকাতা-১৪, হইতে প্রকাশিত।